মণিপুরী সাহিত্য সংগ্রহ

ভূমিকা ও অনুবাদ
শুভাশিস সিনহা
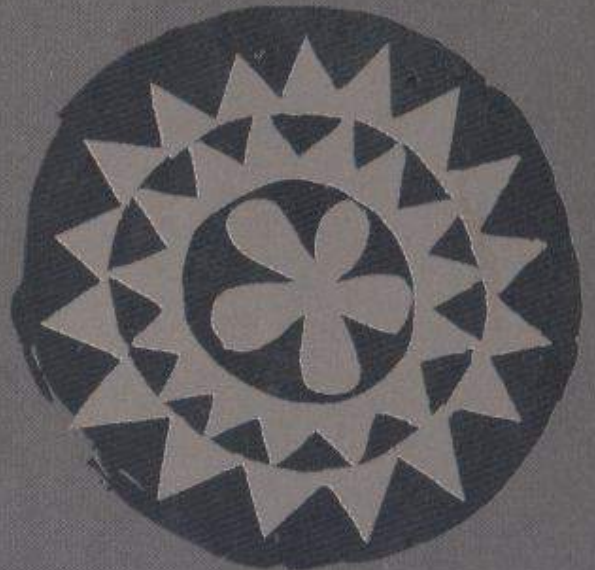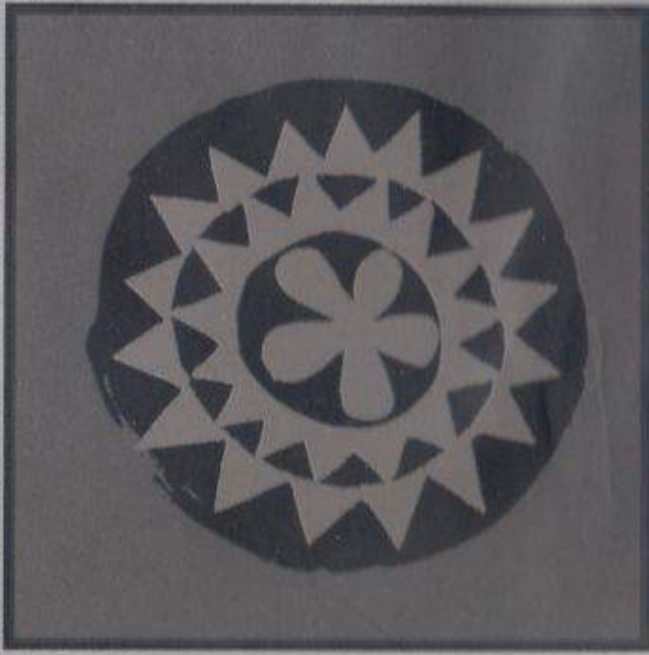
আমরা চরিত্রগতভাবে দূরের লোকটিকে চেনার চেষ্টা করি, পাশের বাড়ির প্রতিবেশীকে নয়। অন্য পৃথিবীর, বিশেষত পশ্চিমা পৃথিবীর লোকজন দেখলে তো কথা নেই। অবাক নয়নে তাকিয়ে থাকি, যেন সম্ভব হলে এক্ষুনি আপাদমস্তক একাকার হয়ে যেতাম তার শরীরে-মনে। নচেৎ, গিলে ফেলতাম তাকে। একই কথা প্রযোজ্য, সে জগতের শিল্প-সাহিত্য-দর্শন সম্পর্কেও। সক্রেটিস, হেগেল, হাইডেগার এমন দু-চারটি নাম উচ্চারিত হলেই ভক্তিতে গদগদ হয়ে উঠতে ধাঁধা থাকে না কোনো। কোনো কবির কাব্য আলোচনা প্রসঙ্গে রিলকে, ইয়েটস, ভালেরি ইত্যাদির নাম এমন কি অপ্রয়োজনে উঠে এলেও আমরা ধরে নেই যে, আলোচিত কবি এবং তার লেখাজোখা নিশ্চয় উঁচু দরের। এই হীনমন্যতা আমাদের মহান উত্তরাধিকার!

মানতেই হবে, আমাদের শিল্প-সাহিত্যের ভুবন বড়োই নিরানন্দময়। টের পাই, সৃষ্টিশীলতার প্রধান ধারাটি দেশীয় নদীনালার মতোই, শুকিয়ে আসছে ক্রমে-ক্রমে। হয়তো অচিরেই, অবধারিত রূপে, পরিণত হবে মরা খাতে। আমাদের জীবনযাপনে, কল্পনায় নেই সংঘর্ষ, দেয়া-নেয়া। সুতরাং, ঔদার্যের প্রসঙ্গ তোলাই অবান্তর। রাষ্ট্রিক-সামাজিক চিন্তা-চেতনার সকল উৎসমুখ বেদখল করে আছে একটি মাত্র সম্প্রদায়, বাঙালি মুসলমান মধ্যবিত্ত বা উচ্চবিত্ত সম্প্রদায়। সে বাঙালিই হোক, মুসলমান বাঙালি হোক, বাঙালি মুসলমান হোক, বা মুসলমানই হোক; তাতে কিছুই যায় আসে না। ঘটনা কিন্তু ঘটছে একটাই। প্রতিনিয়ত সে পরিবেশ-পরিস্থিতি স্বাভাবিক শ্বাস-প্রশ্বাস নেয়াও অসম্ভব করে তুলেছে। দ্বন্দ্ব কিন্তু মূলত:

মণিপুরী সাহিত্য সংগ্রহ

বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী কবিতা ও প্রাচীন মৌখিক রীতির গান

মণিপুরী সাহিত্য সংগ্রহ

বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী কবিতা ও প্রাচীন মৌখিক রীতির গান

ভূমিকা ও অনুবাদ

শুভাশিস সিনহা

ঐতিহ্য

প্রকাশক
মোঃ আরিফুর রহমান নাইম
ঐতিহ্য
রুমী মার্কেট
৬৮-৬৯ প্যারীদাস রোড
বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০

গ্রন্থস্বত্ব
শর্মিলা সিনহা

প্রকাশকাল
মাঘ ১৪১৩
ফেব্রুয়ারি ২০০৭

প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ

মুদ্রণ
ঐতিহ্য মুদ্রণ শাখা

মূল্য : আশি টাকা

MANIPURI SAHITYA SANGRAHA a Literary Works in Bishnupriya Manipuri Translated by Shuvashis Sinha. Published by Md. Arifur Rahman Nayeem Oitijjhya. Date of Publication : February 2007

website : www oitijjhya.com

Price : 80.00 Taka US $ 4.00

ISBN 984-776-475-1

উৎসর্গ

বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষা-আন্দোলনে শহীদ
সুদেষ্ণা সিংহ

ক্ষণজীবি হয়েও যে কণ্ঠ ছেড়েছিল
মাতৃভাষা চিরজীবী হোক
(ইমার ঠার পুঞ্চি পালক)

ভূমিকা

মণিপুর ও মণিপুরী

মণিপুরী জাতিসত্তার আদিভূমি ভারতের মণিপুর। মণিপুর একটি নৈসর্গিক শোভাঋদ্ধ রাজ্য। মণিপুরের ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা যায়, বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন ভাষার মানুষ এসে বসতি গড়েছে। ভৌগোলিকভাবে তারা সবাই *মণিপুরী* পরিচয় লাভ করলেও সাংস্কৃতিকভাবে একটি একক মণিপুরি জাতিসত্তা হিসেবে বিকশিত হয়েছে কেবল *মেইতেই* ও *বিষ্ণুপ্রিয়া*রা। ধর্ম, দর্শন, শিল্পকলা, সংস্কৃতি, পোশাক-আশাক, আচারকৃত্য, ঘরবসতি, উৎপাদনরীতি সবকিছু নিয়ে এ দুই নৃতাত্ত্বিক এনটিটি তাদের ভিন্ন দুই ভাষা নিয়েই মণিপুরি হিসেবে ঐক্য গড়ে তুলেছে।

ভাষার ভিন্নতাই যে জাতিগত ঐক্যের বাধা নয়, তার প্রধান উদাহরণ সম্ভবত মণিপুরীরা। সেখানে ইতিহাসের নানা বাঁক, ঘাত-প্রতিঘাত রয়েছে, ধর্মভাবনায় প্রতিবিপ্লবের ধারা চলেছে, আগন্তুক বৈষ্ণবধর্মের বিপরীতে রিভাইভেলিস্টদের আদি প্রাকৃত ধর্ম নিয়ে উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা আছে, কিন্তু সত্য যে, মণিপুরী সংস্কৃতি ও শিল্পকলা তার যে বিশাল লীলা, পালা, নৃত্য, বাদ্য, গীতিকাব্য, রস নিয়ে বিশ্বমাঝারে অভিপ্রকাশিত, প্রতিষ্ঠিত, তার দার্শনিক ভিত্তি বৈষ্ণবিজম। তবে এ বৈষ্ণবিজম মণিপুরের মাটিতে মণিপুরী চিন্তক ও সাধারণের কৃত্য-আচার চর্চার নিজস্বতার মধ্য দিয়ে স্বাতন্ত্র্য লাভ করেছে। সেটার রূপ-কাঠামো এখন অন্যরকম, নতুন, বিনির্মিত।

অনন্য সাংস্কৃতিক সৌন্দর্য থাকা সত্ত্বেও আন্তঃকোন্দল, বর্মি ও নাগাদের আক্রমণ, ধর্মীয়জটিলতা সব মিলিয়ে এটি ষোড়শ-সপ্তদশ শতকে সংঘাতময় রাজ্যে পরিণত হয়। সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে অনেক মণিপুরী মেইতেই রাজা পামহৈবার অত্যাচার ও রাজনৈতিক নানা কোন্দলে জর্জরিত হয়ে প্রাণ বাঁচাতে আশ্রয় নেয় ভারতেরই আসাম-ত্রিপুরার বিভিন্ন অঞ্চলে, মিয়ানমারে এবং বাংলাদেশে। পরে অষ্টাদশ শতকে বর্মিবাহিনীর আক্রমণে দ্বিতীয় দফায় মণিপুরীরা, বিশেষ করে মোইরাং গোত্রের লোকজন মণিপুর ছেড়ে আসতে বাধ্য হয়। বাংলাদেশের বৃহত্তর সিলেটে এসে তারা পাহাড় জঙ্গল কেটে আবাদ করে নিজেদের বসতি নিশ্চিত করে এবং নিজেদের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি নিয়ে শান্তি-পূর্ণভাবে বসবাস করতে শুরু করে। উত্তরগাঁও, মাঝেরগাঁও, ছনগাঁও, কোনাগাও ও তেতইগাঁও–এই পাঁচটি গ্রাম নিয়ে গঠিত ভানুবিল মৌজায় সর্ববৃহৎ অভিবাসন ঘটে মণিপুরীদের। ৭৫২টি পরিবার অন্তর্ভুক্ত ছিল এ মৌজায়। কৃষি হয় তাদের প্রধান জীবিকা। কিন্তু মণিপুরীরা এখানেও শান্তিতে থাকতে পারে না, ক্রমশ শিকার হতে থাকে নিষ্ঠুর শোষকবর্গের, চিনে নেয় শত্রুর মূল মুখ।

ঔপনিবেশিক শাসক ব্রিটিশদেরকে সরাসরি নয়, তারা পেয়েছিল ব্রিটিশেরই পোষ্য জমিদার আলী আমজাদ খাঁ ও তার নায়েব রাসবিহারী দাশকে। গত শতাব্দীর প্রথম

দশক। আলী আমজাদ খাঁ তৎকালীন লংলার পৃথ্বিমপাশার জমিদার। জমিদার আর নায়েব দুজনে মিলে কৃষকদের উপর চালায় নির্মম অন্যায়, জুলুম, শোষণ। রাসবিহারী রসিদ না কেটেই প্রজাদের খাজনা আদায় করত। ফলে একদিন প্রজারা অবাক দেখতে পায় হিসাবের খাতায় তাদের খাজনা পরিশোধের কোনো চিহ্ন নেই, দলিল নেই। শত শত প্রজার ওপর নোটিস জারি করা হলো। জমিদার ও নায়েবের অত্যাচার, তার উপর পরিশোধকৃত খাজনা পুনর্বার পরিশোধের প্রহসন-নোটিস প্রজাদের বিক্ষুব্ধ করে তোলে। অনিবার্য হয়ে ওঠে প্রতিবাদ, বিদ্রোহ। সেই প্রতিরোধ আন্দোলনে রাসবিহারীকে হত্যা করে তখনকার মতো মণিপুরী প্রজারা একটু স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে, কিন্তু অন্যায় ও শোষণের ধারা পরোক্ষভাবে চলতে থাকে।

বিশ শতকের ত্রিশের দশক। গোটা বিশ্বেই পুঁজিবাদের বিরোধ, সংঘর্ষ, সাম্রাজ্যবাদের চূড়ান্ত রূপ প্রকটিত, অন্যদিকে সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েতের অভ্যুদয়, আশা-হতাশার দোলাচলে বিশ্বের শোষিতশ্রেণির বিপ্লবচিন্তা কম্পমান। উপমহাদেশের উপর অতিকায় ব্রিটিশ উপনিবেশের বোঝা, রাজনৈতিক প্রকল্প-কর্মসূচী, তৎপরতা একাকার হয়ে যাওয়া অসম্ভব ছিল না। তাই ভানুবিলের পঞ্চানন শর্মা, বৈকুণ্ঠনাথ শর্মা, কাসেম আলী, নবদ্বীপ সিংহ, গিরীন্দ্রমোহন সিংহ প্রমুখ কৃষকনেতাদের সাথে আন্দোলনে মতাদর্শে ও প্রত্যক্ষভাবে যোগ দেন তৎকালীন কমিউনিস্ট ও কংগ্রেসের অনেক নেতা। দ্বারিকা গোস্বামী, নিকুঞ্জবিহারী হোস্বামী, পুর্ণেন্দুকিশোর সেনগুপ্ত, চারুবালা দেবী প্রমুখ নেতাকর্মীদের সক্রিয় অংশগ্রহণে প্রান্তিক ভানুবিলের বিদ্রোহ পেয়ে যায় মূলধারার রাজনৈতিক সংগ্রামের মর্যাদা ও তাৎপর্য।

ভানুবিলের কৃষক-আন্দোলনে মণিপুরী নারীদের ছিল ব্যাপক অংশগ্রহণ। এমনকি নেতৃত্বে শরিক হয়েছিল অনেক নারী। লীলাবতী শর্মা, সাবিত্রী সিংহ, শশীপ্রভা দে, যোবেদা খাতুন এমন অসংখ্য বিদ্রোহিনীর সদর্প পদক্ষেপে ভাঙনোন্মুখ কেঁপেছে অত্যাচারীর দুর্গ। এতে বিস্ময়ের কিছু নেই। কৃষিকাজে পুরুষদের সঙ্গে সমানভাবেই অংশ নেয়া মণিপুরী নারীরা তো গর্জে উঠবেই।

দমন-পীড়ন নীতি যথারীতি গ্রহণ করলেন আলী আমজাদ খাঁ। অসংখ্য নেতা-কর্মীকে কয়েদখানায় আটকে রাখলেন। গোটা ভারতবর্ষে তখন চলছিল জাতীয় পর্যায়ে নানামুখী ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন। গান্ধীর নেতৃত্বে সত্যাগ্রহ আন্দোলন নিয়েছিল তীব্র রূপ।

ভানুবিলের কৃষক-বিদ্রোহের অব্যবহিত আগে কুলাউড়ায় ঘটে যাওয়া আন্দোলনগুলোও তখন কর্মীদের অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিল। এছাড়াও বৃহত্তর সিলেটে শোষিত নিম্নবর্গের অসংখ্য বিদ্রোহের ইতিহাস ভানুবিলের কৃষক-প্রজাদের সংগ্রামে, পরিকল্পনায়, নেতৃপর্যায়ের চিন্তা-তৎপরতায় রেখেছিল বৌদ্ধিক প্রায়োগিক ভূমিকা। যেমনঃ পাণ্ডুয়ার খাসিয়া বিদ্রোহ, হবিগঞ্জের কৃষক আন্দোলন, চা-শ্রমিক বিদ্রোহ, লবণ সত্যাগ্রহ আন্দোলন , বিদেশি পণ্য বর্জন আন্দোলন, চৌকিদারি করবিরোধী সংগ্রাম ইত্যাদি।

শোষণ-নিপীড়নের অদূর অতীতকালের অভিজ্ঞতার উত্তরাধিকার, সুস্পষ্ট অবিচার, রাজনৈতিক সংগঠন ও নেতৃবৃন্দের সক্রিয় অংশগ্রহণ প্রভৃতি শর্ত মিলে ভানুবিলের কৃষক-

সংগ্রাম ধারণ করে শোষিত-নির্যাতিতের জাতীয়তাসূচক এক মহা-বিপ্লবের রূপ, যা উপনিবেশ থেকে মুক্তির মহাভারতীয় সংগ্রামের সাথে কোনো না কোনোভাবে এক হয়ে যায়, যার অনিবার্য ফল দাঁড়ায় কৃষকসমাজ বা নিপীড়িতের মুক্তি। গণগ্রেপ্তারের পরোয়ানাও আন্দোলন দমনে বাধা হতে পারেনি। টানা প্রায় তিনবছর সেই আন্দোলন চলে।

এরই মধ্যে অবশ্য ঘটেছিল শাসককুলের পরিবর্তন। জমিদার আলী আমজাদ খাঁর বার্ধক্যজনিত মৃত্যু ঘটলে তার পুত্র আলী হায়দার খাঁ প্রজাশাসনের ভার নেন। আর রাসবিহারীর স্থলে নায়েব হয় প্রমোদ ধর। কিন্তু স্বভাবশ্রেণীতে তারা একই রকম। জমির খাজনা কিয়ার প্রতি দেড় টাকা থেকে বাড়িয়ে আড়াই টাকা করে দেয়া হয়। নিজ ভিটায় গাছ লাগানো বা কাটা ও পুকুর খনন করার অধিকারটুকুও হরণ করে নেয়া হলো। বিদ্রোহী প্রায় ৩০০ কৃষকের ঘর হাতি দিয়ে মাড়িয়ে ভেঙে ফেলা হয়, ক্রোক করা হয় সবকিছু।

আবার আন্দোলন অহিংস নীতিতে চলার শর্তাধীন ছিল বলে অদ্ভুত কৌশল নেয়া হত। জমিদারের পাগলা হাতিকে তাড়াতে প্রজারা শঙ্খ আর ঢাক-করতালের ঝংকৃত শব্দকে ব্যবহার করত। এভাবে অভিবাসিত ভক্তিভাবাপন্ন বৈষ্ণবধর্মাশ্রয়ী মণিপুরী জনগণ নানান কৌশলে সাহসে সংঘটিত করেছে মহাসংগ্রাম।

পরবর্তীতে আন্তর্জাতিক নেতৃবর্গ, যেমন ব্রিটেনের লেবার পার্টিও কৃষক প্রজাদের পক্ষে কথা বলতে বাধ্য হয়। ব্রিটিশ পার্লামেন্টেও এর পক্ষে জনমত গড়ে ওঠে।

ভানুবিলের সফল কৃষক-আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে সিলেট জেলা প্রজাস্বত্ব আইন পাশ হয়। জমিজমার উপর কৃষকদের স্বত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। রচিত হয় নতুন শাসনতন্ত্র।

কৃষক-প্রজাদের সেই বিদ্রোহ ও বিপ্লবের অভিজ্ঞতা ও চেতনা পরবর্তীতে মণিপুরী সংস্কৃতির নানান শাখায় সুশোভিত হয়েছে পুষ্পে পুষ্পে। এ নিয়ে মূলত গণনাট্যধারায় প্রযোজিত হয়েছে নানান পালা। এখনো লেখা হচ্ছে অনেক সাহিত্য-নমুনা।

বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষা

বাংলাদেশের মণিপুরী জাতিসত্তা ভাষার দিক দিয়ে দুভাগে অন্তর্বিভক্ত। মেইতেই ও বিষ্ণুপ্রিয়া।

আমাদের প্রাসঙ্গিক আলোচ্য বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরি ভাষা ও তার সাহিত্য। বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরি ভাষা ইন্দো-এরিয়ান ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্গত। ড.কালীপ্রসাদ সিংহ প্রমুখ গবেষক এ ভাষাকে মাগধী-প্রাকৃত ভাষার সীমানায় নির্দিষ্ট করেছেন। কিন্তু হালের অনেক গবেষক একে *শৌরসেনী প্রাকৃত* হিসেবে উল্লেখ করে গবেষণা চালাচ্ছেন। যা হোক, সেটা চলতে পারে, ভাষা নিয়ে কাজকারবার, মতবির্তক হবে, এটাই স্বাভাবিক। বাঙালি পাঠক যাতে নিজেদের ভাষার সঙ্গে এ ভাষার পার্থক্যের মজাটা ধরতে পারে, তাই এখন আমরা এ ভাষার কিছু বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করছি। বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষায় লিঙ্গ আর বচনভেদে ক্রিয়াপদেরও হেরফের হয়। যেমনঃ

<u>লিঙ্গভেদে ভিন্নতা</u>
থৈবা যাচ্ছে। [থেবা যারগা]
থৈবী যাচ্ছে। [থেবী যেইরিগা]

<u>বচনভেদে ভিন্নতা</u>
আমি যাচ্ছি। [মি যাউরিগা]
আমরা যাচ্ছি। [আমি যারাংগা]
নঞর্থকতা তৈরিতে সাধারণত ক্রিয়াপদের আগে *না* বসে।
যেমনঃ আমি যাব না। [মি না যিমগা]
উচ্চারণের শুদ্ধতায় বলতে গেলে এ ভাষায় শ্বাসাঘাতের ধ্বনি খুবই কম।

মোটামুটি এ হচ্ছে একেবারেই মৌলিক আইডেন্টিফিকেশন। বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষা তার সমাজের নানা অনুষঙ্গের সাথে মিলে মুখোমুখি হয়েছে প্রবল আঘাত ও নিপীড়নের। এদিক দিয়ে বলতে গেলে সবচেয়ে নিপীড়িত ও পোড় খাওয়া ভাষা এটি। গত শতাব্দীর পঞ্চাশের দশক থেকে অন্তিম পর্যন্ত সুদীর্ঘ প্রায় পঞ্চাশ বছরের রক্তক্ষয়ী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে এ ভাষাটি ভারতে প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি পেয়েছে। হাজারো ছাত্র-তরুণের কারাবরণ ও ভাষাবীরাঙ্গনা সুদেষ্ণা সিংহের আত্মাহুতির মধ্য দিয়ে ভাষাটি আসাম ও ত্রিপুরার বিদ্যালয়গুলোতে পাঠ্যভাষা হিসেবে স্বীকৃত হয়। এরপরও তাকে মুখোমুখি হতে হয়েছে অহেতুক অযৌক্তিক সব অভিযোগ ও মামলার। অনেক দিনের আইনি লড়াইয়ের পর এই তো মাত্র গত ৮ মার্চ ভারতের সুপ্রিমকোর্টে জনৈক মেইতেইয়ের দায়ের করা একটি মামলার বিপরীতে রায় আসে, তার ফলে বিষ্ণুপ্রিয়া ভাষা ও জাতিগতভাবে *মণিপুরী* পরিচয়ের অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করল।

বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষা-আন্দোলনের কথা

বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষার সাংবিধানিক স্বীকৃতি ও প্রাথমিক স্তরে শিক্ষা-কার্যক্রম চালু করার দাবিতে ভারতের আসাম ও ত্রিপুরায় গত শতকের পঞ্চাশের দশক থেকে প্রায় অর্ধশত বছর ধরে সংঘটিত হয়েছে একটি রক্তক্ষয়ী আন্দোলন। সে আন্দোলনের চরম পর্যায়ে পুলিশের গুলিতে আত্মাহুতি দেন বিদ্রোহী তরুণী সুদেষ্ণা সিংহ। ১৯৯৬ সালের ১৬ মার্চে আসামের করিমগঞ্জ জেলার বিলবাড়িতে মণিপুরী ছাত্র তরুণদের ডাকা ৫০১ঘন্টার *রেল রোকো কর্মসূচিতে* অংশ নেয়া সুদেষ্ণা সিংহের আত্মত্যাগকে স্মরণ করে ভারত ও বাংলাদেশে মণিপুরী (বিষ্ণুপ্রিয়া) সম্প্রদায় প্রতিবছর দিবসটি শহীদ সুদেষ্ণা দিবস (মতান্তরে বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষা শহীদ দিবস) নামে উদ্‌যাপন করে আসছে।

আসাম ও ত্রিপুরায় বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষাভাষী উলেখযোগ্য সংখ্যক মানুষের মাতৃভাষার প্রাথমিক শিক্ষালাভের দাবিটি যৌক্তিকতা পায় ভারতের সংবিধানে এ- বিষয়ক একটি ধারা থাকার সূত্রেই। ১৯৫৫ সালে মণিপুরী জনগণের প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠন *নিখিল বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী মহাসভা* প্রথম এ দাবিতে আন্দোলনের ডাক দেয়। রাজ্য-সরকারের ঔদাসীন্য, ছলচাতুরি, নেতিবাচক প্রতিক্রিয়ার কারণে দুটি রাজ্যেই একটি জাতিসত্তার অস্তিত্বের সাথে সম্পর্কিত প্রাণের দাবিটি মুখ থুবড়ে পড়ে বারবার। তবু আন্দোলন থেমে থাকে না। ভাষিক সংখ্যালঘু বিষয়ক কমিশনসহ নানান রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের সঙ্গে পত্র ও স্মারকলিপি সহ নিয়মতান্ত্রিক মাধ্যমে বারবার বৈঠক হয় মণিপুরী নেতৃবৃন্দের, পরবর্তীতে তা বিরাট গণআন্দোলনের রূপ নেয়। জনগণের ন্যায্য দাবিকে ব্যর্থ করে দিতে আসামের সেন্সাস রিপোর্টের গণনায় দেখানো হয় নানারকম প্রতারণা। আসামের একটি জেলার লোকগণনায় হাস্যকরভাবে যখন একজনমাত্র মণিপুরী (বিষ্ণুপ্রিয়া) জাতিসত্তার লোক উলেখ করা হয়, তখন তা আন্দোলনকে বিক্ষুব্ধ করে তোলে। প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। ভাষার দাবির সঙ্গে জাতিগত পরিচয়ের আরও উপাদান সম্পর্কিত হয়। ১৯৬৮ সালের ১ জুলাই কাছাড় জেলায় হাজার হাজার ছাত্রনেতা ও অসংখ্য সংগঠন রাস্তায় গণমিছিল বের করে, স্কুল-কলেজে পিকেটিং হয়, ১৯৬১ সালের বিকৃতিভরা সেন্সাস রিপোর্টের কপি পোড়ানো হয়। তারপর আসাম সরকার যখন আশ্বাস দিয়েও পরবর্তীতে তার বাস্তবায়নে গড়িমসি করে, তখন মণিপুরী (বিষ্ণুপ্রিয়া) ছাত্রছাত্রীরা গণঅনশন পালন করে। ১৯৬৯ সালে মিছিল-মিটিং, ঘেরাও, অনশন কর্মসূচিতে কারাবরণ করে আট শতাধিক আন্দোলনকারী। ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে '৬৯ এর ৮ নভেম্বর কাছাড়ের ছাত্র-তরুণেরা বিশাল মিছিল নিয়ে রাস্তায় নেমে আসে। তাদের উপর চলে পুলিশের নির্মম নির্যাতন। ১৯৭৪ সালের ৬-৯ মার্চ ৭২ ঘন্টার গণঅনশন শেষে কাছাড়ে গঠন করা হয় *Bishnupriya Manipuri Seven Point Action Committee*। ভাষার দাবিটিকে কেন্দ্রে রেখে আরও ৬টি দাবি নিয়ে আন্দোলন জোরদার হয়ে ওঠে। ১৯৮৩ সালের ২৬ অক্টোবর আসামের মুখ্যমন্ত্রী হিতেশ্বর শইকিয়া আসাম কেবিনেটে সিদ্ধান্ত

নেন, পরের শিক্ষাবর্ষ থেকে *বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী* ভাষা চালু করার। *Gazette Noification* হবার পরও তা সম্পূর্ণ অন্যায় হস্তক্ষেপে স্থগিত হয়ে যায়। পরের বছর *নিখিল বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সাহিত্য পরিষদ* তাদের সুদীর্ঘ আন্দোলনের তথ্য ও দলিল সংবলিত পুস্তিকা *Let History and Facts Speak about Manipuris* নিয়ে দিলতে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। সে বৈঠকও পরবর্তীতে ব্যর্থ প্রমাণিত হলে *নিখিল বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী স্টুডেন্টস্ ইউনিয়ন* নানামুখী আন্দোলনের কর্মসূচী ঘোষণা করে। অবশেষে ১৯৯৫ সালের ২৬ মে ত্রিপুরা সরকার প্রাথমিক স্তরে বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষা চালু করে। কিন্তু আসামে এ দাবিটি তখনও সাফল্যের মুখ দেখেনি। আন্দোলনও থেমে থাকে না। সে আন্দোলনের সূত্র ধরে পাথারকান্দিতে ৫০১ঘন্টার রেল অবরোধ কর্মসূচী ঘোষণা দেয়া হয়। ১৯৯৬ সালের ১৬ মার্চে সেই কর্মসূচীতে বিদ্রোহী তরুণী সুদেষ্ণা সিংহ পুলিশের গুলিতে মৃত্যুবরণ করলে গোটা আসাম বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। গণআন্দোলনের মুখে আসাম সরকার মণিপুরী (বিষ্ণুপ্রিয়া) জনগণের দাবিটি মেনে নিতে বাধ্য হয়। অর্থনৈতিক সাপোর্ট নিয়ে তারপরও চলতে থাকে নানান কূটকৌশলের বিস্তার। ২০০১ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি তারিখে Deputy Director, Elementary Education বরাক উপত্যকার ৫২টি প্রাথমিক স্কুলে বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষার প্রথম পাঠ্য বই *কনাকপাঠ* তৃতীয় শ্রেণিতে চালু করার নির্দেশ দেন। ১২ ফেব্রুয়ারি তারিখে তার আনুষ্ঠানিক বাস্তবায়ন হয়। বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষা- আন্দোলনের অর্ধশত বছরের ইতিহাসে কারাবরণ করেছেন দুই হাজারেরও বেশি আন্দোলনকর্মী,আহত হয়েছেন অসংখ্য, তবে প্রাণ দিয়েছেন একজনই, সুদেষ্ণা সিংহ। এক বিপ্লবী নারী। তাই বহু ঘাত-প্রতিঘাতের সেই আন্দোলন থেকে আজ মণিপুরী (বিষ্ণুপ্রিয়া) জনগণ আলাদাভাবে চিহ্নিত করেছে ১৬ই মার্চকে। একটি অকাল মৃত্যুর মধ্য দিয়ে একটি ক্ষুদ্র জাতিসত্তার ভাষা স্বীকৃতি অর্জন করেছে।

বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী কবিতা ও সাহিত্যিক তৎপরতা

বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সাহিত্যের প্রধান এলাকা আসাম ও ত্রিপুরা। সেখানে প্রায় তিন লাখ মণিপুরী আছে। এবং অসংখ্য সাহিত্যিকও। তুলনায় বাংলাদেশে নানা রাজনৈতিক জৈবনিক অস্থিরতার কারণে সাহিত্যের ধারাটা তেমন বেগবান নয়। প্রথাগতভাবে যদি মণিপুরী সাহিত্যের ইতিহাস বিশ্লেষণ করি, তাহলে পর্যায়গুলো হবেঃ প্রাচীন, প্রাক-আধুনিক এবং আধুনিক সাহিত্য।

মণিপুরী কাব্যসাহিত্যের এ যাবৎ পাওয়া প্রাচীনতম নিদর্শন হিসেবে বলা হয় *বরণ ডাহানির এলা* [বৃষ্টি ডাকার গান] ও *মাদই সরালেলর এলা* [মাদই সরালেলের গান]। কৃষিসমাজের সাথে সংশ্লিষ্ট এ গানগুলো মণিপুরে বৈষ্ণবধর্ম প্রবেশেরও আগের সময়ের। ভাষা, শব্দ, বাক্যগঠন সবকিছুতেই পাওয়া গেছে প্রাচীনতার নমুনা। মাদই ও সরালেল বা ইন্দ্রের ইহ-দৈবিক সম্পর্ক, তার সংকট ও নানা ভাবাবেগে মাদইয়ের আর্তি নিয়ে রচিত হয়েছে মাদই- সরালেলের গান। *আপাঙর য়ারি* বা বোকার গল্প নামে এক ধরনের লোকগল্প প্রচলিত আছে বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরীদের মধ্যে। তবে সাহিত্যের বিভিন্ন পর্যায়ের বৈশিষ্ট্য উল্লেখের ফাঁকে বলে রাখা দরকার, সংস্কৃত নানা পুরাণ, ধর্মগ্রন্থ ও বৈষ্ণব পদকর্তাদের রচনাকে নিজস্ব ভাষায় রূপান্তরিত করে বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরীরা ধর্মমূলক সাহিত্যচর্চার ধারাটি অক্ষুণ্ন রেখেছে আজ পর্যন্ত।

প্রাক-আধুনিক পর্ব বলা যায় গত শতকের ত্রিশের দশক থেকে পঞ্চাশের দশক পর্যন্ত কালকে।

১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে আসামে প্রকাশিত হয় পত্রিকা *জাগরণ* আর একই সময় গঠিত হয় মণিপুরী সমাজের প্রধান সংগঠন *নিখিল বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরি মহাসভা*। একটা জাতিগত অস্তিত্বের সম্মানের আকাঙ্ক্ষা মাথাচাড়া দেয় মণিপুরীদের মাঝে। মহেন্দ্রকুমার সিংহ লেখেন *মণিপুরের প্রাচীন ইতিহাস*। আর গোকুলানন্দ গীতিস্বামী সমাজ সংস্কারমূলক নানা গান, গীতিপালা লিখে সেগুলোর পরিবেশনা নিয়ে ঘুরতে থাকেন গ্রামে গ্রামে। তাঁকে বলা হয়ে থাকে চারণকবি। সমাজ রাজনীতি বিষয়ে তার জ্ঞান ও মতাদর্শ ছিল খুব স্বচ্ছ ও শক্তিশালী। তিনি গোঁড়ামি ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে গানে গানে তার অবস্থান স্পষ্ট করেন, একটা রেনেসাঁসের প্রতিবেশ তৈরির প্রয়াসী হন। তার একটি গানের বাংলা তর্জমা এমনঃ

অজ্ঞানআঁধারে আর ঘুমাবে কদিন

ওঠো সবে, জ্বালাও হে জ্ঞানের পিদিম।

আবার –

কালে কালে কালের কথা না শুনলে চলবে না

বনে যদি আগুন ধরে কাঁচা পাকা বাছবে না।

একটি অনগ্রসর কৌম সমাজের জন্য তার এসব আধুনিক বাণী কাজ করেছে শাণিত অস্ত্রের মতো।

আধুনিক যুগের শুরু ধরতে হবে ষাটের দশকের একেবারে শুরু থেকে। *ফাগু* [১৯৬০], *পাঞ্চজন্য আজ্জুনী* [১৯৭০], *প্রতিশ্রুতি* [১৯৭৪] ইত্যাদি পত্রিকা প্রকাশিত হয় নতুন নতুন লেখক ও চিন্তা নিয়ে। আর কবিতায় পথিকৃৎ হিসেবে আবির্ভূত হন ব্রজেন্দ্রকুমার সিংহ। যিনি *ধনঞ্জয় রাজকুমার* ছদ্মনামেই পরবর্তীতে বেশি পরিচিতি লাভ করেন। নতুন চিন্তা, নতুন কাব্যবীক্ষা, বৈশ্বিক চেতনার সাথে জাতিগত ঐতিহ্য ও অনুষঙ্গের শৈল্পিক সংশ্লেষ, বিশাল কাব্যহৃদয়, তীক্ষ্ণ ও অপরিমেয় কাব্যশক্তি নিয়ে এ-কবি বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী কাব্যসাহিত্যকে বিশ্বমানের করে তোলেন। তাঁর প্রায় সমকালেই আবির্ভূত হন সেনারূপ সিংহ, মদনমোহন মুখোপাধ্যায়, জগৎমোহন সিংহ প্রমুখ কবি। সেনারূপ সিংহের *আনৌপী* একটি অনবদ্য কাব্যগ্রন্থ। তাঁর কবিতার ছন্দ, গীতলতা পাঠকের জন্য একটি দারুণ পাঠঅভিজ্ঞতা। মদনমোহন মুখোপাধ্যায়ের কাব্যাবেগের শক্তি যে কোন পাঠককে স্পর্শ করবে। কথাসাহিত্যে ত্রিপুরার প্রয়াত স্বাস্থ্যমন্ত্রী বিমল সিংহের নাম উল্লেখযোগ্য। বাংলায় লেখা হলেও তার *ইঙেললেইর মেয়ের বিয়ে* গল্পটি মণিপুরী সমাজের নৃতাত্ত্বিক সাহিত্যিক ভাষ্য হিসেবে যথেষ্ট আলোচিত হয়েছে।

পরের দশক থেকে আরো গতিশীল ও বহুমাত্রিক হয়ে ওঠে বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সাহিত্য। প্রকাশিত হতে থাকে *ত্রিপুরা চে* [১৯৭৯ থেকে আজ পর্যন্ত], *এবাকা* [১৯৮০], *নুয়া এলা* [১৯৮২ থেকে এখন পর্যন্ত নিয়মিত] প্রভৃতি পত্রিকা। বর্তমানে *লোকতাক, পঞ্চশ্রী, কাকেই, সরালেল, আমার পৌ, চেতনা* প্রভৃতি অসংখ্য ছোট কাগজ ও পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে। প্রকাশিত হচ্ছেন অনেক লেখক, নিজস্ব বৈশিষ্ট্য নিয়ে এর পরের প্রজন্মে এক ঝাঁক তরুণ সাহিত্যিক ভাঙাগড়ার ব্রত নিয়ে বিশ্বের নিপীড়িত মানুষের সাহিত্যিক কণ্ঠস্বরকে পাথেয় করে মাঠে নামেন কলম হাতে। চাম্পালাল সিংহ, মথুরা সিংহ, দিল্ লক্ষ্মীন্দ্র সিংহ, সমরজিৎ সিংহ, বিশ্বজিৎ সিংহ, রঞ্জিত সিংহ প্রমুখ কবি ভাষার নতুনত্বে, চিন্তার অভিনবত্বে এবং জাতিগত রাজনৈতিক বীক্ষায় গড়ে তোলেন বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী কাব্যসাহিত্যের সৌধ। সমরজিৎ সিংহ বাংলা সাহিত্যেও প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন। ডিটাচমেন্ট তৈরির কাব্যকলা [গ্রন্থ: *ঈশ্বর মাঙছে মেইথঙে*] ও মার্কসিস্ট ভিউ বিশ্বজিৎ সিংহের কবিতাকে স্বাতন্ত্র্য দিয়েছে। রঞ্জিত সিংহ রূপকল্প [কাব্যগ্রন্থ: *মোর ইমার ঠার মোর প্রেমর কবিতা*] ও মথুরা সিংহ পরিমিত হিউমারের দক্ষতায় [কাব্যগ্রন্থ: *ইমা*] কোনো কোনো কবিতাকে ভাস্বর করে রেখেছেন।

সমান্তরালে বাংলাদেশে বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী কাব্যসাহিত্যের কথা বলতে গেলে আসবে গত শতাব্দীর সত্তুরের দশকের কথা। ত্রিশের দশকে ভানুবিলের কৃষক-আন্দোলন এবং পরে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণসহ মণিপুরীরা রাজনৈতিক বিভিন্ন সংগ্রামে অংশীদার ছিল। আর সাহিত্য বা শিল্পকলার চর্চাটা ওইভাবে বেগবান হতে পারেনি। তবে রাসলীলা, নটপালা, বাসকসহ নানা কাব্যগীতাশ্রয়ী পালার মধ্য দিয়ে ক্ল্যাসিক্যাল সাহিত্যচর্চার কৃত্যমূলক ধারাটি সক্রিয় ছিল বেশ।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সাহিত্যচর্চা সুস্পষ্টত শুরু হয় বলা যায়।

প্রকাশিত হয় *খংচেল* [১৯৭৩], *ইমার ঠার* [১৯৭৯], *মিঙাল* [১৯৮১], *সত্যম* [১৯৮১] ইত্যাদি সাহিত্য-সংস্কৃতির পত্রিকা।

কবিতায় আসেন রণজিত সিংহ, গোপীচাঁদ সিংহ প্রমুখ।

নব্বইয়ের দশক থেকে বাংলাদেশে বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সাহিত্যচর্চা বেশ গতিশীল হয়ে ওঠে। প্রকাশিত হতে থাকে *পৌরি* [১৯৮৯], *জাগরণ* [১৯৯১], *যেবাকা যেদিন* [১৯৯১], *ইথাক* [১৯৯৪] প্রভৃতি সমাজ-সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ক জার্নাল ও পত্রিকা। লেখক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন সুখময় সিংহ, সুকুমার সিংহ প্রমুখ। এসময় তরুণ কবি সুখময় সিংহের কাব্যগ্রন্থ *তোর নিংশিঙে* ভাষা ও আঙ্গিকের মধ্য দিয়ে একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হিসেবে জনপ্রিয় হয়।

বর্তমান শতকের প্রথম থেকে আরও অনেক তরুণ কবি ও সম্পাদক ব্রতী হয়েছেন বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে তুলতে। সংগ্রাম সিংহ সাংবাদিকতায় এক উজ্জ্বল নাম। তিনি বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরি ভাষায় বাংলাদেশে তথ্য ও নিউজভিত্তিক পত্রিকা *ইথাক* বের করেন। বর্তমানে সুশীলকুমার সিংহ বের করছেন বাংলাদেশে প্রথম বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী মাসিক পত্রিকা *পৌরি*। সাহিত্য, সমালোচনা, প্রবন্ধ, অনুবাদ, খবরাখবর প্রভৃতি নিয়ে *পৌরি* মণিপুরী ভাষাসমাজে বর্তমানে একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে চলেছে। নিয়মিত না হলেও সুমন সিংহ গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন লেখা নিয়ে বের করেছেন *গাওরাপার* বেশ কয়েকটি সংখ্যা। অঞ্জন সিংহের সম্পাদনায় বের হচ্ছে দ্বিমাসিক সাহিত্যপত্রিকা *কুমেই*। আধুনিক লিটল ম্যাগ হিসেবে *কুমেই* উজ্জ্বল স্বাক্ষর রাখছে। শুভাশিস সমীরের সম্পাদনায় অনিয়মিতভাবে বের হচ্ছে *মণিপুরী থিয়েটারর পত্রিকা*। মণিপুরী ছাড়াও বাংলাদেশের অপরাপর ক্ষুদ্র জাতিসত্তার সাহিত্য, রাজনীতি, আন্দোলন বিষয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ লেখা বের হচ্ছে এই পত্রিকায়।

গত শতাব্দীর শেষে প্রথম কাব্যগ্রন্থ *ছেয়াঠইগির যাদু* বের হলেও শুভাশিস সমীরকে বলা যায় নতুন শতকের শূন্য দশকের কবি। এ শতকেই প্রকাশিত হয়েছে তার উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ *সেনাতম্বীর আমুনিগৎত সেম্পাকহান পড়িল অদিন* [২০০৩] ও *নুয়া করে চিনুরি মেয়েক* [২০০৫]। এ শতকে কবিতা লিখছেন রাজমণি সিংহ, সুনীল সিংহ সহ আরও অনেক তরুণ কবি।

অনুবাদ প্রসঙ্গে

কবিতার অনুবাদ প্রায় অর্থহীন একটা ব্যাপার। রবার্ট ফ্রস্ট বলেছেন, কবিতা তা-ই, যা অনুবাদ করলে হারিয়ে যায়। ভাষার আড়ালে কবিতা নিজেই একটা ভাষা। একটা বিশেষ চলন, ভঙ্গি, বয়ান। যত কমিউনিকেটিভ ভাষাভঙ্গি রচনার চেষ্টা চলুক না কেন দেখা যায় শেষত কবিতা, সাহিত্যের অভিজ্ঞতায়, খুব বেশি স্পর্শকাতর। কবিতা ভাষা নয় ভাষার অন্তর, দেহের পোশাক পাল্টানো যায়, কিন্তু অন্তরের পোশাক কীভাবে ? অন্তরের পোশাকই বা কী !

তবু অনুবাদ হয়, হয়ে আসছে। ফিল্ম্ বা চলচ্চিত্র এক্ষেত্রে এগিয়ে আসছে। দৃশ্যগত বা ভিজুয়াল মিডিয়া এক্ষেত্রে যে অর্থে ইউনিভার্সেলটি পায়, শ্রুতির জগৎ তা পেতে খুব বেশি সমস্যায় পড়ে। কবিতাতো আমরা শুনিই। পড়াও এক ধরনের শোনা। অক্ষর বা চরণগুলো মনে মনে উচ্চারিত হয়।

কবিতার অনুবাদের আরেকটা দরকারি হেতু রয়েছে, কবির ব্যক্তিক অনুভূতিকে তার সমাজ- প্রতিবেশের ভিতর থেকে একেবারে গহিনের উপলব্ধিতে আবিষ্কার করা। সেখানে কাহিনি বানাবার তৎপরতা থাকে না, থাকে উচ্চারণ আর বয়ান, স্বয়ম্ভু। এর নৃতাত্ত্বিক মূল্যও আছে। আর নান্দনিক বোঝাপড়া ও বিনিময়ের খেলাটাতো আছেই।

তাই এবেলা বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী কবিতা অনুবাদ করতে বসা।

বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষার শব্দ ও বাক্যের অনেক নিজস্বতা, প্রকরণের স্বকীয়তা, নরম কোমল ঢঙ কি আনা যাবে বাংলায় ? আসলে তা সম্ভব নয়। তবু আপ্রাণ চেষ্টা করেছি একটা ভাষিক মেলবন্ধন ঘটাবার, যেখানে কোনো ভাষারই তেমন কোনো কাব্যিক নান্দনিক ক্ষতি না ঘটে। আশা করি, বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষার উল্লেখযোগ্য সব কবিই অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন এ সংকলনে। তারপরও কেউ যদি বাদ পড়ে থাকেন, সে অনাকাঙ্ক্ষিত ভুলের জন্য আমি ক্ষমাপ্রার্থী। আশা করি পরবর্তী সংস্করণে এ বিষয়ে খেয়াল রাখা হবে। *মণিপুরী সাহিত্য সংগহ*-র এ পর্বে থাকল কবিতা ও গান; দ্বিতীয় পর্বে রূপকথা, ছোটগল্প, নাটক ও প্রবন্ধ সংকলিত হবে।

এ কাজের জন্য প্রেরণা ও তাগাদা দিয়েছিলেন সমকালীন বাংলা ভাষার শক্তিমান কবি মোহাম্মদ রফিক। অনুবাদ বিষয়ে বিভিন্ন সময়ে পরামর্শ দিয়েছেন বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষার প্রধান কবি ধনঞ্জয় রাজকুমার [ব্রজেন্দ্রকুমার সিংহ]। তাঁদের সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা জানাই।

মা-বাবা-দাদা আর দিদি সংসারের সকল ভার থেকে আমাকে মুক্ত রেখে নিরন্তর উৎসাহ ও ভালোবাসা দিয়ে আমার সামান্য কাজগুলোকে অসামান্যতার গর্বে আন্দোলিত করে তোলে, নিজেকে এদিক থেকে ধন্য মনে করি।

আমার অন্যান্য কাজের মতো সীমাহীন আগ্রহ আর উচ্ছ্বাস নিয়ে এ কাজেও জ্যোতি সাহায্য করেছে, কম্পোজ করে দিয়েছে অসংখ্য কবিতা।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র জাহিদুল ইসলাম রবির উদ্ভাবিত *শব্দ লেখো* নামের চমকপ্রদ বাংলা স্পেলচেকার সফ্‌ট্‌ওয়্যারটির কারণে সহজ ও ত্বরান্বিত হয়েছে এ বইয়ের পাণ্ডুলিপি-সংশোধন। আশা করি ওর সফ্‌ট্‌ওয়্যারটির বহুল প্রচার হবে।

পৌরি পত্রিকা-র সম্পাদক সুশীলকুমার সিংহ গ্রন্থ ও তথ্য সংগ্রহ থেকে শুরু করে এ বইয়ের প্রুফ রিডিঙে পর্যন্ত অবাধ সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে আমাকে ঋণী করেছেন।

ঐতিহ্য-র আরিফুর রহমান নাইম বহুদিন বাক্সবন্দি পাণ্ডুলিপিটাকে মুদ্রণ-সাজে সাজিয়ে পাঠকের দরবারে হাজির করার উদ্যোগ নিয়েছেন।

তাঁকে ও সকলকে আবারো জানাই অশেষ ধন্যবাদ।

প্রান্ত ও কেন্দ্র – সমগ্র ভূগোলের কবিতার আবেগে ও চিন্তায় আলোড়িত হোক নন্দনবিশ্ব।

শুভাশিস সিনহা
ঘোড়ামারা, কমলগঞ্জ
৯ জানুয়ারি ২০০৭ মঙ্গলবার

সূচিপত্র

বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষার একটি নমুনা

মনশিক্ষা বা দেহতত্ত্বের গান

গুরুর খয়া থাম্পালগ
মনহান তি অ ভ্রমরগ
জীবনে মরণে নিংকরিছ
দিয়া তোর ঠইগ

ভ্রমরাই মধু পিতারা
বনে বনে বুলিয়া
গুরুর চরণ নিংকর মনহান
মায়ার জাল ছিরিয়া
শ্রী গুরু বৈষ্ণব কৃষ্ণ
না খাল্করিছ ভিন্ন
শিক্ষাগুরুর কৃপা থাইলে
পেইতেই ব্রজর কৃষ্ণ...

সরল আক্ষরিক অনুবাদ

গুরুর চরণ পদ্মফুল
মন তুমি হও ভ্রমর
জীবনে মরণে তাকে স্মরণ করো
হৃদয় দিয়ে
ভ্রমরা মধু পান করে
বনে বনে ঘুরে
গুরুর চরণ স্মরণ করো হে মন
মায়ার জাল ছিঁড়ে
শ্রী গুরু বৈষ্ণব কৃষ্ণ
অন্য কিছু আর ভেবো না
শিক্ষাগুরুর কৃপা পেলে
পাবে ব্রজের কৃষ্ণকে।

বরন ডাহানির এলা বা বৃষ্টি ডাকার গান

দল বেঁধে এ গানটি করলে খরার সময় দেবতা সরালেল বৃষ্টি ঝরিয়ে দেন–মণিপুরীদের এ এক প্রাচীন বিশ্বাস। তবে গবেষক ও ভাষাবিদ কালীপ্রসাদ সিংহ বলছেন, তিনি মণিপুর থেকে ত্রিপুরা পর্যন্ত ঘুরেও কারো কাছে গানটির সম্পূর্ণ অর্থ খুঁজে পাননি। একমাত্র নরসিংহপুরের শ্রীমতী নিংথী দেবী নামে এক বয়স্ক মহিলার কাছে তিনি গানটির খানিক ব্যাখ্যা পেয়েছিলেন। তার ভাবার্থ হলো: মণিপুরের খুমোল বংশের রাজা মৈরাং বংশীয় রাজার কাছে যুদ্ধে পরাজিত হয়েও আরেকবার শক্তি পরীক্ষা করার জন্য যুদ্ধের প্রস্তাব রাখলে খুমোল রাজার ছোট ভাই চমেই তাতে আপত্তি জানায়। তখন খুমোল-রাজা রাগান্বিত হয়ে তাকে সভার মাঝখান থেকে পদাঘাত দিয়ে বের করে দেন। দুঃখে অপমানে চমেই রাজ্য ছেড়ে বের হয়ে যায়। চমেই এভাবে চলে যাচ্ছে দেখে বেটি [চাকরানি] তার সাথে ধীরে ধীরে হাঁটতে শুরু করে। অনেক দূর গিয়ে চমেই যখন বেটিকে দেখতে পেল, তখন সেই নির্জন জায়গায় তাকে আর ফিরিয়ে দিতে না পেরে সাথে করেই নিয়ে গেল। এক সময় বেটির গর্ভে চমেইর এক সন্তান জন্ম নিল। এভাবে কেটে গেল তিনটি বছর। এ তিন বছরে খুমোল- রাজ্যে বৃষ্টিবাদল একেবারে বন্ধ হয়ে গেল, চারদিকে নেমে এল দুর্ভিক্ষ। জ্যোতিষীরা বললেন, চমেইর অপমানে দেবতা পাহাংপা ক্রোধান্বিত হয়ে বৃষ্টি বন্ধ করে দিয়েছেন। চমেই ও বেটিকে সন্তুষ্ট করে রাজ্যে ফিরিয়ে আনতে পারলে আবার বৃষ্টি হবে। জ্যোতিষীর কথা শুনে প্রজারা গিয়ে চমেই ও বেটিকে সন্তুষ্ট করে রাজ্যে ফিরিয়ে আনল। পাহাংপা খুব খুশি হলেন। শুরু হলো ঝুমঝুম বৃষ্টি। সবাই ক্ষেতের কাজে নেমে পড়ল আর অনেকে লুসু নিয়ে মাছ ধরতেও শুরু করল।

গানটির রচনাকাল নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে কালীপ্রসাদ সিংহ নানান যুক্তি-তথ্যের অবতারণা করে শেষত সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, গানটি ষোড়শ শতকের শেষ ভাগ থেকে সপ্তদশ শতকের প্রথম দশক পর্যন্ত সময়ের মধ্যে রচিত ও গীত হতে শুরু করেছে। তবে এটা নিঃসন্দেহ যে, মণিপুরীদের বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণের আগে এ গানটি প্রচলিত হয়েছে।

১

ওহে সরালেল দেবতার রাজা, খুমোলের মাটি আজ
খরায় শুকিয়ে ফেটে ফেটে যায়, এ কী ভয়ানক সাজ!
খইমু যে তাই ঘাসে আর নানা জিনিষে মিলিয়ে
তৈয়ার করছে বাঁধ
ওহে দেবরাজ খা খা করে আজ খুমোলের ভূমি
দাও বৃষ্টিপ্রপাত।

২
হে রাম, তুমিই বলো এ নিদানে কে পারবে কিছু খেতে
বলো কে পারবে একটু সময় ঘুমাতে বা নিশ্চিতে ?
[আমি] আমার সকল আনন্দ-শোক সঁপেছি বেণুর কাছে

হে কালা, হে চির প্রতিবেশী আমাদের
সবাইকে দাও ডাক
এসো এইখানে একত্রে সবে কাঁদি
সবকিছু পড়ে থাক।

৩
ও বাবা তাম্ফা, দেখেছে দুমেই জ্যোতিষবিদ্যা গুণে
গঙ্গা আসছে, তবু পাহাংপাকন্যা
কারঙ্গ তাকে বাধা দিল সব শুনে।
সকল দেবতা জানে নিশ্চয় দুর্দশা আমাদের
শুধু অনুরোধ মোইরাঙ যেন পায় নাকো কিছু টের।

৪
জ্যোতিষীরা বলে এ অনাবৃষ্টি পাহাংপার কারণে
চমেইয়ের অপমানে যে ক্ষুব্ধ হয়েছে দারুণ মনে।
উপদেশ দিল চমেই এবং বেটিকে সেখানে আনতে
যথারীতি তারা হলো যে হাজির নির্দেশ মানতে।
বেটির কন্যা পৌছাল ওই সুবিশাল প্রান্তরে
মঙ্গলকর বার্তাধ্বনিতে জগৎ মুখর করে
(সে) ধনের দেবতা কুবেরের মতো যায়
গৌরবেরই নানান ছলাকলায়।

৫
মাদই বুননকর্মের থেকে হয়েছে বহিষ্কৃত
বেটির কাছে সে নানান সময় হয়েছে অপমানিত।

৬

চমেই আসতে করছে ইতস্তত
মহিলারা মিলে সবে তার সাথে
হয়েছে দুর্বিনীত।
ক্রুদ্ধ বয়সী লোকেরা তাদের বলছে স্বাগত নয়
বরং কয়লা আর বালু দিক ছিটিয়ে সে পথময়।
এটাই ভাগ্য পাহাংপা প্রভু
দেয়নি তাদের শাস্তি এখনো, কভু।

৭

বৃষ্টি নামতে শুরু হয়ে গেল আর
খুশি পাহাংপা আসতে থাকেন হয়ে বড় খাল পার।
মেয়েরা ভাসছে আনন্দে তারা জানালো যে আহ্বান
সুদীঘল কেশে ফুলেল কর্ণে হোক আজ নাচগান।

৮

মুষলধারায় বৃষ্টি নেমেছে, ঝরঝর ঝরঝর
মানুষ নেমেছে খালে আর বিলে মাছ ধর মাছ ধর।
মাথার উপরে নাই কোনো ছাতা নাই
আনা যে হয়নি বন্ধুর সুকথায়।

৯

বাঁধছে কজনে ধানের আঁটি যে কত
বৃষ্টির ফোঁটা দেখায় রুপার মতো
কচুপাতাগুলো বৃষ্টিকণাকে রাখতে পারে না ধরে
পারছে না কেউ বৃষ্টির তোড়ে ফিরতে নিজের ঘরে।
সকলে অধীর কখন ফিরবে বাড়ি
এদিকে তখন ক্ষুধার্ত প্রভু পাহাংপা চায় আম
বৃষ্টি থামে না, ক্যামনে যে আম পাড়ি।

মাদই-সরালেলর এলা বা মাদই-সরালেলের গান

অলকগো পাড়ার একটি মেয়ে ও সরালেল [সূত্রে, মণিপুরীদের আদিদেব পাহাংপার অধীনে বৃষ্টির দেবতা] –এই দুজনের বিয়ে এবং গার্হস্থ্য জীবনকে কেন্দ্র করে লোকগীতিটি প্রচলিত হয়েছে। জানাচ্ছেন ভাষাবিদ ও গবেষক ড.কালীপ্রসাদ সিংহ। তাঁর ভাষ্যমতে, গানটি সম্ভবত বৈষ্ণবধর্ম মণিপুরে অনুপ্রবেশের সময়কার রচনা। কারণ, গানটিতে মদ্যপান আর শুয়োরের মাংস ভক্ষণের উল্লেখ আছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণের পরে মদ-মাংস সম্বন্ধীয় এ ধরনের রচনা অসম্ভব। তবে মদ-মাংস যে মণিপুরী সমাজে ঘৃণ্য বস্তু হয়ে দেখা দিতে শুরু করল, তার নিদর্শনও গানটিতে আছে। সেজন্য দেখা যায়, মদ-মাংস খেয়ে ফেলবে এই সন্দেহে সরালেল মাদইকে বাপের বাড়িতে যেতে দেয়নি। এভাবে গানটির ভেতরে একটা সামাজিক দ্বন্দ্বের পরিচয় পাওয়া যায় এবং তা হয়তো গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম ও মণিপুরীদের আদি বা প্রাকৃত ধর্ম–এ দুয়েরই দ্বন্দ্ব। সরালেল খুব সম্ভবত গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মে নতুনভাবে দীক্ষিতদের একজন। সুতরাং মাদই সরালেলের গান মণিপুরে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম সর্বজনস্বীকৃত হবার আগেকার রচনা, অর্থাৎ ১৮শ শতকের প্রথমার্ধের রচনা।

১

মাদই গিদেই যাত্রা করল যত্নে সবাই বিদায় দিল
আহা গেল কত দূরে
পাহাড়-পর্বত পেরিয়ে গেল কেউ তো নাহি দেখতে পেল
আহা গেল কত দূরে
দু'হাত তুলে দেখো রে তার মা মা বলে কী চিৎকার
আহা দূরেই চলে গেল!

২

শুনছো কি রাজা শুনছো শুনছো কি রাজস্বামী
বাবার ঘর যে পুড়েই যাচ্ছে এক্ষণি যাব আমি।

যেও না মাদই যেও না কে বলে পুড়ছে তোমার বাবার ঘর
যাব রাজা যাব, মোরে সোনার মইটা নামাও মাটির 'পর।
সেই আমাদের ঘর যে পুড়ছে যাব আমি, যাব, সয় না যে অন্তর।

যেও না মাদই যেও না, তোমার বাপের বাড়ি যেওনা
সেখানে গেলেই জানি নিশ্চিত খাবে শুয়োরের মাংস

আর তুমি পান করবে মদও ধুলায় মেশাবে বংশ।
না না রাজা, মদ পান করব না [শুয়োরের] মাংসও নাহি খাব
সোনার মইটি নামিয়ে দাও হে যাব রাজা আমি যাব।

[তবে] করিফাবাকে এখানে রেখে যাও সোনার মইটা নামিয়ে দিলাম
বাপের বাড়িতে গিয়ে ফের কোনো লম্বা পিড়িতে বসো না
খাবে নাকো ভুলে শুয়োরমাংস মদে ডুবিও না রসনা।

৩
মাদই গিদেই নামছে যে ওই মই দিয়ে
ঢাক-করতাল বাজছে, গাইছে পাখিও গুনগুনিয়ে
মাদই গিদেই নামছে যে ওই মই দিয়ে।

মেয়ে এসেছে রে, এসেছে মা মণি লম্বা পিড়িটি বের করো

বসব না বাবা বসব না ওই লম্বা পিঁড়িতে বসব না
রাজার নিষেধ, না মানা যে ভয় লম্বা পিঁড়িতে বসব না।

এল মা আমার, কই কে কোথায় সাজাও নানান পদ
রাঁধো শুয়োরের মাংস, জলদি বের করে দাও মদ।

না না বাবা আমি খাব না ওসব মদও পান করব না
ছোঁব না মাংস শুয়োরের, ওই পিঁড়িতেও বসব না।

৪
সাত তাম্বুল দেব যে টাঙিয়ে
সাতটা মশারি দেব রে খাটিয়ে
কেউ দেখবে না মা মণি তখন
যাও করো পান ইচ্ছেমতন

সব গেল বাবা, আজকে আমার সব হয়ে গেল শেষ
মই তুলে নিল রাজা, চলে গেল স্বর্গ নিরুদ্দেশ।
কেঁদো না গো সোনা, ওমন কেঁদো না, করিফাবা মোর ওরে
মাদই গিদেই কাঁদছে আহারে পুত্রের নাম ধরে।

গোকুলানন্দ গীতিস্বামী

গোকুলানন্দের জন্ম বর্তমান মৌলভীবাজার জেলার কমলগঞ্জ থানাধীন মাধবপুরের জবলার পার গ্রামে, ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে ২৬ নভেম্বর তারিখে। মাত্র ১৬ বছর বয়সে গোকুল ভারতের ত্রিপুরার কৈলাসহরে চলে যান। অত্যন্ত মেধাবী তরুণটি সেখানে শিক্ষাগ্রহণে মনোনিবেশ করেন। একদিন স্বজাতির এক মহিলার প্রতি অন্যায় নির্যাতন দেখে গোকুল সহ্য করতে না পেরে নিজেকে প্রকাশের উপায় খুঁজতে থাকেন। শুরু করেন নিজের ভাষায় গান ও নাট্যপালা লিখতে। গান গেয়ে গেয়ে তিনি সমাজকে জাগানোর দায়িত্ব কাধে তুলে নেন, পাশাপাশি চলে নাট্যপালা মঞ্চায়ন। *গীতিস্বামী* তাঁর যথাযোগ্য উপাধি। তা এখন তাঁর নামেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ। ভারত-বাংলাদেশ দুদেশেই মণিপুরী সমাজে অত্যন্ত জনপ্রিয় এ গীতিকবি ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দের ১০জুলাই মৃত্যুবরণ করেন, সেদিন ত্রিপুরা সরকার গোটা রাজ্যে ছুটি ঘোষণা করে। *মাতৃমঙ্গল কাব্য, সমাজ সংস্কার* সহ অনেক নাট্যপালা লিখেছেন ও অসংখ্য গান নিজে লিখে সুর দিয়েছেন। সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি গোকুলানন্দ ত্রিপুরা বিধানসভার বিধায়ক পদেও দীর্ঘদিন কর্মরত ছিলেন।

মাতৃবন্দনা

তোমার মহিমা এ অবোধ শিশু কীভাবে প্রকাশি মা
থাকে যত দোষ সন্তান বলে করিও তুমি ক্ষমা।
মা
তোমার মহিমা বেদেও অসীমা
করুণারূপিনী তুমি
কী গুণ গাইব আমি
গয়া বা তীর্থ কাশী বারানসী
শাস্ত্রের মতে সবই পবিত্র জানি
সবারও তবু থাকে কলঙ্ক, শুধু মা শব্দটি
আজো অকলঙ্কিনী।
বহ্নিপুরাণে লেখা আছে এই
গুণের ওজনে পিতা থাকবেন মাতার অর্ধেকেই
গর্ভধারণং পোষণাভ্যাং ততোমাতা গরীয়সী
মাতা তুমি মহীয়সী

গর্ভে ধরেছো আমাদের তুমি দশমাস দশদিন
জন্ম দিয়েছো আলো দেখিয়েছো, কী অপূর্ব ঋণ!
দাঁড়াতে পারিনি খেতেও পারিনি কিছু
বাঁচিয়েছো তুমি, জ্ঞানপর থেকে আমরা তোমার পিছু
হিংসামূর্তি মাতা যে বাঘিনি সে তার স্বভাবমতো
কখনো নিজের সন্তানদের ভক্ষণ করে না তো
পাঁচ সন্তান যদিও তোমার আলাদা আলাদা সবে
তোমার কাছে মা সকলি সমান রবে
লোকে যাকে করে ঘৃণা
তোমার কাছে যে সে মানিক ধন, সোনা
যে ছেলে তোমার নিশ্চল কানা খোঁড়া
বলতে পারো না ভুলেও– এবার নাও হে মৃত্যু চোরা।
বরং একটু অসুখ হলেই তার
ভাতপানি ভুলে শিয়রে শিয়রে করে যাও হাহাকার।
জন্মের কালে দিয়েছো যে মায়া তাকে
শেষাবধি তা-ই কেউ পারে ধরে রাখে
যাও স্নেহে চুমি চুমি
তুমি মা পেরেছো, তুমি!
এ মায়ের স্নেহসিন্ধুর এক বিন্দু শুধব বলে
দেশে দেশে আমি তারই গুণ গেয়ে একা একা যাই চলে
এতটুকু যদি শুধিতে পারি সে ঋণ
পাগলের মতো গুণে যাই সেই দিন
এই আশা নিয়ে বেঁচে থাকি মাগো
দিয়ো নাকো দূরে ঠেলে
তোমার গানে ও কীর্তনে থাকি
বিভোর তোমার ছেলে!

কৃষ্ণধন সিংহ

কৃষ্ণধন সিংহ গত শতকের বিশের দশকের কবি। জন্ম আসামরাজ্যের হাইলাকান্দি জেলার ঝাপিরবন্দ গ্রামে। একটা আরতিমূলক নিবেদন ও আত্মশুদ্ধির প্রয়াস তাঁর কবিতাকে অন্যরকম করে চেনায়। প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থঃ *কবিতার ঝাপিগুলি*।

হে আমার অশ্রু

হে আমার অশ্রু
আমাকে একটু শান্তি দাও
দুঃখের সমুদ্রে পড়ে অপার উদ্‌ভ্রান্ত আমি
তোমাকে নিয়েই যেনো প্রাণ ফিরে পাই
আনন্দজোয়ার আসে যখন গোপনে
তুমিও তখন আসো
আনন্দের চূড়া গিয়ে আকাশ পেরিয়ে গেলে
তুমি হে চোখের জল, নেমে আসো আমার দুচোখে
শান্ত দাস্য রসের ভেতরে
তুমি যেন চোখ ভরে আসো
ঈশ্বরের কথা আমি ভেবেছি যখন
তখনই তোমার দেখা পেলাম হে জল
একা আমি ভাবি
এ ধোঁয়াশা ঘোচাতে পারি না
তবু তুমি সুখে দুঃখে আমার সঙ্গেই থাকো সখা

হে আমার অশ্রু, তুমি নির্দয় হয়ো না যেন শেষে।

চন্দ্রমোহন রাজকুমার

চন্দ্রমোহন রাজকুমারের জন্ম আসামরাজ্যের কাছাড় জেলার রাজনগর গ্রামে। গীতিকবিতার আদলে নশ্বর জীবনের করুণ, নিরাভরণ বিবৃতি তিনি প্রকাশ করেন প্রকৃতির বিপ্রতীপ চিরন্তনতার ভেতরে। তাঁর কবিতা সহজেই পাঠকহৃদয়কে ছুঁয়ে যায়। উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ: *চিংখেইর এলা*।

যাবার বেলা

গান গেয়ে যাই একা
আমি
যাবার বেলা।

বসন্তের ওই কোকিল এসে
ডাকবে যখন সুরে
ফুলের বুকে পাবে প্রাণে
আমার লেখা, খুঁড়ে।
কোন সে পথিক গান গেয়ে যায়
ঘুমের মাঝে অবাক সুরে
জাগিয়ে দিল তোমায়,
ব্যথার বুকে ছলছলিয়ে
চোখের জলের খেলা
গান গেয়ে যাই একা আমি
যাবার বেলা।

শেফালি মালতী
জুঁই, বেলি বা যূথী
এই বসন্তে নতুনের আহ্বানে
ডাকবে কোকিল নতুন দিনের গানে
পান্থের সুরে দেখবে তখন
নবজন্মের মেলা
গান গেয়ে যাই একা
আমি
যাবার বেলা।

মদনমোহন মুখোপাধ্যায়

মদনমোহন মুখোপাধ্যায়ের জন্ম আসাম রাজ্যের করিমগড়গঞ্জ জেলার শিংলা অঞ্চলের পাঁচডালী গ্রামে। গত শতাব্দীর চল্লিশের দশক থেকে লেখালেখি শুরু । ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে শিলচর গুরুচরণ কলেজের মুখপত্র *পূর্বশ্রী*-র সম্পাদক নির্বাচিত হন। অনেকদিন তিনি নিখিল বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সাহিত্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন। তাঁর কবিতা এক্সপ্লোসিভ নয়, ইম্প্রেসিভ। প্রকৃতির সাথে মানবিক অভিমানের খেলায় মুখর। উপলব্ধিগুলোকে তিনি সাজান সহজ ও প্রাকৃত জীবনদর্শনের ভিত্তি থেকে। উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ: রঙ *ফিরক, তেন্না* ককক্ ও *ঠইগ*।

অনুরোধ

ফুলের বসন্ত এলে তোমার দুয়ারে
নিমন্ত্রণ দিয়ো না আমাকে।

আজকের ভ্রমরাটি সেদিন অবধি
সেদিনের গান করতে গিয়ে
তাল-ছন্দ চমৎকার কিছু গীতিকায়
যদি তার ভুল হয়ে যায়
ক্ষমা করে দিয়ো ভালোবেসে
ভালোবেসে তার গান শুদ্ধ করে দিয়ো

ফুলের বসন্ত এলে তোমার দুয়ারে
নিমন্ত্রণ দিয়ো না আমাকে
তোমার ঐ বসন্তের কালে
আমার সম্মানে রাখা আসনখানির কথা ভাবতেই
অন্য এক ভয় ঢোকে গোপনে শরীরে
তবুও তোমার তোমার কাছে আকুল প্রার্থনা
ঘৃণার ওপারে গিয়ে তবুও ভোলো না

ফুলের বসন্ত এলে তোমার দুয়ারে
নিমন্ত্রণ দিয়ো না আমাকে।

জীবনের গান

শীতের তীব্রতা যত
বসন্তের বেশি দেরি নেই
বসন্ত আসার আগে জীবন সাজাই।

খরার পেয়েছি বহু আগে
গান বাঁধবার–
জীবনের গান বাঁধবার
করে যাই আপ্রাণ লড়াই।

সে গানে হারাবো কোকিলেরে
এ কোনো অলীক কথা নয়
তাই তো বিশ্রাম নেই
মুগ্ধ অবসরে

এ বেলা জিতব বলে
নাছোড়বান্দার মতো
দিনরাত এতদিন
ক্ষান্ত হয়ে আছি।

শীতের তীব্রতা যত
বসন্তের বেশি দেরি নেই
জীবনের গান গেয়ে গেয়ে
(এসো) জীবন সাজাই।

সময় এলে

ফুল ফুটবার কালেই যে ফুল ঝরে গিয়েছিল
সেই ফুলটির চোখের পানি আজও আমার মনে
লেগে আছে, যায় না মুছে, দীর্ঘশ্বাসে নোয়
ভাবনাখানি, দিশাহারা, দারুণ সংগোপনে।

এই হৃদয়ের কোণে কোণে ভূমিকম্প, ঝড়
লড়ক্‌খড়ক্‌ উথালপাথাল কে কেমনে মাপে
মরণ ঝরন! হাজার হলেও এমনতরো নেশা—
নিশ্চিত এক শঙ্কায় এই বুক নীরবে কাঁপে।

এবার যেন ওমন না হয়, কুঁড়ি হতেই ঝরা
কথার ডালি, সুখ-আহ্লাদ, হাসি-গানের খেলে
ভ্রমরাটি করুক শুরু নতুন কোনো গান
জীবন সাজাবার প্রয়াসে আসুক বিভোর ফুলে।

ফুল ফুটবার সময় এলে তোমাদেরকে ডাকব
দেব না ফুল ঝরতে জেনো—মরলে আমিই মরব।

সেনারূপ সিংহ

বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী আধুনিক কাব্যআন্দোলনের অন্যতম পুরোধা সেনারূপ সিংহের জন্ম বাংলা ১৩৩৫ সনের ১৩ মাঘ আসামের কাছাড় জেলার বিক্রমপুর পরগণার মোহনপুর গ্রামে। তাঁর কবিতায় পাওয়া যায় বৈষ্ণব রসাশ্রয়ী ঐতিহ্যবাহী মণিপুরী শিল্পকলার ভেতরের সুরটি। একটা কোমল রোমান্টিকতা তাঁর কবিতার মূল সম্পদ। কবিতার পাশাপাশি গানও লিখেছেন প্রচুর। উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ: *চিরিবিরি বৌ খা*, *শাতনির খৌরাঙ* ও *আনৌপী*।

ফোটার তৃষ্ণায়

তোমার উদ্যানে আমি ফুটে উঠব সখী
শেফালি ও বকুলের মতো
আলো কিবা অন্ধকারে দেখো অন্তহীন
ডালি ভরে ঝরব অবিরত।

দখিন হাওয়ার মতো তোমাকে বাতাস দেব আমি
শতবার চামর দুলিয়ে
ভিতরসমুদ্রে জেনো দোলাব তোমায়
পারিজাত সুগন্ধে বুলিয়ে।

তোমারই আলোয় আমি আলোকিত মালা
গলায় শরীরে বেঁধে রেখে
তোমাকে মোহিত করে তুলব ধীরে ধীরে
হৃদয়পদ্মের ঘ্রাণ মেখে।

পথে পথে পড়ে থেকে নিষ্করুণ দলে
পদচিহ্ন এঁকে নেব বুকে
তোমার স্মরণে ফুটে তোমার নামেই ঝরে গিয়ে
রব আমি প্রাণময় সুখে।

আমার দুঃখিনী কবিতা

তোমার আঁচল পারে পারে স্বপ্নরঙ মিশুক
অনুরাগের চাদর তোমার শরীর ঢেকে রাখুক
আলোকরাঙা দেহে কোমল ফুলদলেরা নও নওয়াক
দুধ-বুদ্‌বুদ জোছনাধারা তোমার করুণ মুখ সাজাক
মধুর বীণার ঝংকার যেন হয় তোমারই সুর
সেই আলাপে অঝোর ঝরুক অমৃত মধুর
তোমার দেহের গন্ধে পারিজাতও লজ্জা পাবে
তোমার বাঁশির সুরে চুড়ির ছন্দ মিশে যাবে
প্রেমে ব্যথায় দুচোখ বুজে নামুক আঁধার বরিষা
একটু হাসতে আনন্দ সুখ উপচে পড়ুক সহসা
লিরি লিরি মলয় বাতাস খাংচেৎটির পাক্‌চা
প্রেম-কক্‌নামের মণির আলো অন্ধকারের দিশা
তৃপ্তিসুখে ফুলে ফুলে শরীরটা ওই সাজিয়ে
থাকো প্রিয়া জনমভর এ প্রাণে সংগীত বাজিয়ে
মধুর মায়া ভালোবাসার চেতনাকেই ছেয়ে
স্বর্ণমৃণাল পাম্পল দিয়ে রাখো আমায় জড়িয়ে
হাওয়ায় গন্ধে মাতামাতি তুমি আমি থাকতে
আলো-আঁধার জড়াজড়ি বাধ্য এদিন কাটতে
মরণগাঙও পাড়ি দেব জীবনসুধা পানে
মৃত্যুর বুকে অমর ভূমে বাঁচব নতুন গানে।

খাংচেৎ : কোমরবন্ধনী
কক্‌নাম : নৃত্যে ব্যবহৃত অলঙ্কার বিশেষ
পাম্পল : হাতের যে অংশটি কাঁধের সাথে যুক্ত

ব্রজেন্দ্রকুমার সিংহ

বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী কবিতার পথিকৃৎ ব্রজেন্দ্রকুমার সিংহের জন্ম ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দের ১২ ফেব্রুয়ারি আসাম রাজ্যের শিলচরের পাকইরপার গ্রামে। বর্তমান নিবাস আসামের হাইলাকান্দিতে। রাস, পালা, বাসক প্রভৃতি শিল্প-আঙ্গিকের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত মণিপুরী গীতি-বয়ানের সূত্র ধরে তিনি সমকালের মণিপুরী কবিতার সুশোভিত মালা সাজাতে চেষ্টা করেছেন এবং সফল হয়েছেন। ঐতিহ্যের গীতলতা, ছন্দ, স্বকীয় বয়ানভঙ্গিকে নিয়ে তিনি তাঁর কবিতার আধুনিকতা নির্মাণ করেছেন। ব্রজেন্দ্রকুমার সিংহ বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী কাব্যসাহিত্যের এক প্রতিষ্ঠান। তিনি একাধারে কবি, গল্পকার, নাট্যকার, প্রাবন্ধিক, অনুবাদক, সমালোচক, শিশুসাহিত্যিক। মাতৃভাষার পাশাপাশি বাংলা ভাষাতেও তিনি সিদ্ধহস্ত। লেখার পাশাপাশি সম্পাদনা করেছেন *সাহিত্য*, *প্রতিশ্রুতি* প্রভৃতি পত্রিকা।

উল্লেখযোগ্য গ্রন্থঃ *লেহাও ফুলগরে*, *এলার খুৎতল*, *চিকংলেই ও জিনজিনি* [কাব্য]
সিকাডেইনী [গল্প]
চক্রবৃদ্ধি, *কণ্ঠগিরো ও মেইকেই* [নাটক]
পৌরেই ও বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ছন্দ পরিচয় [গবেষণা]
সাহিত্য ও প্রতিশ্রুতি [সম্পাদনা]

মন এক গভীর অরণ্য

এ মন এক গভীর অরণ্য
বন্ধু, তোকে খুঁজেও পেলাম না আমি আজ
মন এক গভীর অরণ্য
চতুষ্কোণে তার ছায়া

আমি কোন দেশের নিষাদ
কার জন্য অপেক্ষা করলাম এতদিন
কার পায়ের পাতা লাল হয়েছে আমার তীরে বিঁধে
কোন সমুদ্র কেমন দেশ ডুবিয়ে দেয়
সূর্যহীন ছায়ায় ছায়ায় দিনগুলো অনিকেত

এই মন এক গভীর অরণ্য

নিজের মুখটি চিনলাম না আমি আজ
হাতের বাকল, চূড়ার পালক
গলার মালা... চিনলাম না কিছুই আমার

এ মন এক গভীর অরণ্য
যন্ত্রণা আমার সামনে পেছনে
নিজের স্মৃতিতে কিংবা ভবিষ্যতে

আমি হব কেমন নিষাদ

মন এক গভীর অরণ্য
ছায়ায় ছায়ায় ভরেছে বিষাদ।

ধনঞ্জয় রাজকুমার

ধনঞ্জয় রাজকুমার ব্রজেন্দ্রকুমার সিংহের ছদ্মনাম হলেও এ নামে লেখা তাঁর কবিতাগুলো সহজেই পৃথক বৈশিষ্ট্যে বিশেষায়িত করা যায় । উত্তর-আধুনিকতার জাতি, সংস্কৃতি, অতীত, শেকড় ও আধুনিকতার পুঙ্খানুপুঙ্খ যাচাই-বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে নির্মিত সৃষ্টিকাণ্ডকে ধারণ করেছেন নিজের বিশাল কাব্যক্ষমতায়। পরবর্তী কবিদের জন্য আধুনিক মণিপুরী কবিতার আদর্শ রূপটিই এঁকে দিয়েছেন ধনঞ্জয়।

উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ :

হপনর বাবুয়ানি, ডিগল আতহানল মোরে, ভিক্ষা দেনে এরে আহিগিতৌ ও হমাজি গাটর পানি [কাব্য]

লক্ষ্মী গিথানক ও রাজপ্রশ্ন [নাটক]

রুবাইয়ৎ-ই-ওমর খৈয়াম, মিকুপর চেরীফুল [জাপানি হাইকু কবিতা], কুরৌ আহান রবীন্দ্রনাথ, কালিদাসর মেঘদূত, অনুবাদকল্প [অনুবাদ]

কিছু অক্ষর

ও নির্বাক ঠোঁটের নীরবতা
কিছু অক্ষর দাও আমাকে

এরকম কুৎসিত অকর্মণ্য
শব্দ নয়,নয় তাদের চিৎকার
এরকম ময়লা, বিবর্ণ পঙ্‌ক্তিও নয়
শুদ্ধ–অশুদ্ধ বিবেচনাহীন ভাষা নয়
নয় কোনো অর্থহীন সুর।

মানুষ কখনো দেখেনি, এমনকি সূর্যও দেখেনি যাদের
এমন নতুন কিছু অক্ষর চাইছি আমি।

এই নিষ্ঠুর শব্দগুলো আমাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে
মারল এতকাল।
কাঁকড়ার মাতৃভোগের মতো এই বুক ছিঁড়ে খেয়ে
জর্জর করে দিল
তারাও আর বেঁচে থাকবে না, জানি।

আমার কথা শুনবে, ভালোবাসবে, ডাকলেই চলে আসবে
সবুজ গন্ধময় এমন কিছু শব্দ দাও
আমি নতুন করে তোমার সাথে
গল্প শুরু করব।

একটি কুকুরের প্রতি

মানুষের বারান্দায় এসে
ঘুমানো কুকুর
আমার সম্মানে গড়া স্মৃতিসৌধটিকে
আজন্ম তোমার নামে লিখে দিয়ে যাব
দুঃখ করো না।

বলে দাও

আমরা যেদিন জলের কাছে গিয়েছিলাম, জল ছিল ঘুমে। ঘুম ভাঙাতে মায়া হলো বলে স্নান করিনি। আমাদের ওষ্ঠলগ্ন অক্ষরদেরও স্নান দেইনি আমরা। দুঃখটাকে পারলাম না জলাঞ্জলি দিতে।

আমাদের হাতে কে তুলে দিয়েছে এই ত্রিতাপ। আমরা শুদ্ধ নই। তাই কোনোকিছু উৎসর্গে অক্ষম এখনো। হে শালপ্রাংশু আকাশ, তোমার পায়ের তলে মরার ভাগ্যে জন্মানো এই পোকাপিঁপড়ের জীবন নিয়ে আমরা কী করব, বলে দাও।

খবর

কণ্ঠকে বললাম–চারদিক খুঁজে খুঁজে খবর নিয়ে এসো
কিছুক্ষণ পর প্রতিধ্বনি ফিরে এলো
বলল, রোদ-বৃষ্টি-বরিষা-শরৎ-সকাল-বিকাল সবদিকে নিয়েছি
চাঁপাগাছে একটিমাত্র ফুল
শৈশবের সাথে স্মৃতির সাঁকো হয়ে আছে।
ওইদিকে পার হয়ে দূরে একটি দ্বীপ নিয়ে দেখলাম
কতদিন কতযুগ কত জন্মের স্বপ্নকে
এক আশ্চর্য গন্ধ পাহারায় রেখেছে
নিয়ে যাওয়া অভিজ্ঞানটুকু হারিয়ে
পরিচয় দিতে পারলাম না
যদিও পেয়েছি, একে অন্যকে চেনা হলো না
কেউ কারো কথা পারলাম না বুঝতেই
প্রতিধ্বনি হাহাকার করে বলল–
কেন আমাকে ওই পথে পাঠিয়েছিলে!

পথ

পথকে মালা পরিয়ে দাও
ওই পথের গর্ভ থেকে আমাদের জন্ম হয়েছিল।

মমতার ছায়া

মমতার ছায়া! তোমার শীতলতায় চাওয়াগুলো জিরোক এবার। কণ্ঠাবিধ ঢেলে দিয়ো বিরহফুলের রং। এ দিনের হাতে আমি দিলাম খঞ্জনি। তার তালে ভেসে থাক স্নিগ্ধ নীরবতা।

আকাশে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছ নিরুপায় তুমি হে সংবাদ। হৃদয় কি জানে ওই গোধূলি মিলিত অশ্রুধারার সংলাপ!

আমি আর যাব না উৎসবে, দেখব না ছিন্ন হয়ে থাকা সুন্দরতা।

কিছু নাও, কিছু রেখো আমার জন্যও। আমি তো ঋণের দায়ে চলা এক নিদানপুরুষ, মনে নেই কারও কাছে পেয়েছি জীবনভর মায়া।

তৃষ্ণাকে পাঠাল দূরে আজকে সবাই। একটু জিরোক। আবার ফেরার পথে ডেকে নেব পৌঁছানোর দায়।

এখানে ছিল

এখানে থোকা থোকা হলুদ ছিল, ভেসে গেল দূরে। কোনো তীর বিদ্ধ করেছে এই অসহায় কণ্ঠ। আঙুল থেকে ঝরে পড়ে বিষের প্রপাত। অশ্রুর চূড়ায় ঝরে জন্মান্তরের বিস্মৃত ঋতুটির মতো ম্লান কোনো সাজ।

শব্দসমুদ্রের পারে বধিরপুরুষ এক ভিক্ষা মাগে। ফিরে গেছে তীর। নীল জামা ছেড়ে আকাশ রোদ্দুরে পথ চেয়ে আছে।

দুটি চড়ুই, গেরুয়া প্রকৃতি, অসহায় ভূমি, উপবাস, স্মরণ, মনে করা, ভুলে যাওয়া এক ধূলির কণার মতো ভাসে।

রং

খড়ের উপরে রাখা মাটিলেপা দুঃখের শরীরে
কারা মেখে দিয়েছিল রং
স্বর্গ-মর্ত্য-রসাতলে সে রঙের ধারা
অনন্তের প্রপাতে মিশেছে।

অবকাশহীন

নদীর উপর নুয়ে পড়া মেঘগুলোকে দেখবার
কেউ নেই
কাজে ব্যস্ত মানুষেরা
নদীটির চোখ ভিজে আসে
মেঘের ঠোঁটে আগুন
অন্ধকার মশারি হয়ে ঢেকে দেবে।
মানুষ এখনো পায়নি অবসর
রোগজারি, শিশুর কান্না, গল্প-গুজব।
ছবিটি দুই পারের দিকে ভেসে যাচ্ছে বাতাসে
কাউকেই ছুঁতে পারে না।

যাবার পরে

তোমার শরীরের হিমগন্ধ এখানে ঘুরে ঘুরে এসেছিল
পথের মানুষেরা তার কতো গল্প করে গেল
পবিত্র জলের মতো হৃদয়ে লেগেছে তার ছোঁয়া
আনন্দে ভেসেছে কোনো ফুল
সূর্য এক প্রেমিকের মতো পড়েছিল গলে
কে হেঁটে গেছে ? তার পায়ের ধুলোয় সাজা
গোধূলির পথে পথে আজ যাত্রা করব আমি
এখানে, নাকি আরো দূরে!
ইহজন্মের মায়া, এতটা আঁকড়ে রেখো না আমায়
দুঃখের বাগানে একটি প্রজাপতি ঘুরে গেছে এতদিন
কেউ আসে নাই
আমার ফেরার দিন তোমাদের বলা কথা
কেন সব ভুলে আছো বলো।

কোথায় ছিলে তোমরা

আমি যেদিন আনন্দে মেতেছিলাম,
কোথায় ছিলে তোমরা ?
আনন্দে ভেসে গেল গ্রাম-ঘর, উঠানের ফিরাল
ঘরের চালে বসে থাকা রোদ

আনন্দে ভেসে গেল তৃষ্ণায় জ্বলে পোড়া স্মৃতির কাঠিসুরি
চাঁদ তার শীতল আলোকফোঁটা উড়িয়ে দিল
আকাশ থেকে উঠানে উপর
আমি যেদিন আনন্দে ডুবেছিলাম।

এসো ফুল ছিঁড়তে যাই
ফুলশিশুরা খেলা করছে এই নিদানে
আজ তো দুঃখের দিন
ঝড়-বৃষ্টি, খরা-রৌদ্র–কিছুই সংগত নয়
সবেমাত্র জন্ম নেয়া শিশুটিকে বলে দাও
চিৎকার করে যেন না কাঁদে আজ।

আমি যেদিন আনন্দিত হয়েছিলাম
কেতকী বনের সাপটিও মাথা নামিয়েছিল
তোমার স্নানের জল আবিরের মতো
ভেসে গেল অনন্ত গোধূলির আকাশ পর্যন্ত।

কী মানত করেছিলাম মনে নেই
কী যেন অর্ঘ দেব ভেবেছিলাম!
হে সুবর্ণ পাখিরা, হে আত্মীয় বাতাস,

হে ধূলিকণা, পাতের একটি অন্ন, বিরহবিধুর স্বপ্ন
হে নতুন বৌয়ের ফিয়ম
বলে দাও, কী দেব বলেছিলাম।
আর দিন নেই, কাছে আসা স্বপ্নটাকে ঠকিওনা আর,
গজগামিনী রাত্রি

তারার মালা পরা অন্ধকার
আজ তো রথের চাকাও মাটিতে ঢুকে যাওয়ার দিন
যেদিন আমি আনন্দে ভেসেছিলাম
কোথায় ছিলে তোমরা ?
কাঁটার বনে ঝরা রক্ত থেকে ফুল ফুটেছিল
তাদের উপর ভ্রমরা-ভ্রমরী এসে করেছিল
গোপন গল্প
অপূর্ব উজ্জ্বল গন্ধ সূর্যের সাথে মাঠে গিয়ে
মেতেছিল খেলায়
সাঁকো পেরিয়ে এলে বসন্তের সুন্দর
ওসবতো দেখো নাই
আমি যেদিন আনন্দে ভেসেছিলাম
সেদিন কোথায় ছিলে ?

কাঠিসুরি: মণিপুরী মেয়েদের পরিহিত কারুকার্যময় এক ধরণের স্বর্ণহার

চন্দ্রকান্ত সিংহ

কবি সম্পাদক চন্দ্রকান্ত সিংহের জন্ম ভারতের করিমগঞ্জ জেলায় শিংলার নয়াগ্রামে ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে। সরল সংকেতের মধ্য দিয়ে কবিতা নির্মাণ করেন। কবিতা-সংকলন *মালিনীর* সম্পাদনা ছাড়াও তিনি মাসিক পত্রিকা *নুয়া এলার* পৃষ্ঠপোষক হিসেবে আছেন। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : *বারুণীর কীর্তি*, ভৃগু ও পুলোমা। বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষায় অনুবাদ করেছেন কালিদাসের *মেঘদূতম্* ও *ঋতুসংহার*।

অভিবাস

কিছুদিন আগে
পথ দিয়ে যেতে আমি দেখলাম
ছোট্ট এক ফুলগাছ
ছোট ছোট চমৎকার ফুলে জায়গাটি
সাজিয়ে রেখেছে আর ছড়িয়েছে অবাক সৌরভ
ছোট ছোট কুঁড়িগুলো চেয়ে থাকে চোরা চোখে
ফোটার তৃষ্ণায়

কিছুদিন পর
ফিরে আসতে দেখি
গাছের সে জায়গায় জমে আছে ঝোপঝাড়
ফুলের সে গাছগুলো ঢেকে দিয়ে সব
সে জায়গাটিই আছে
শুধু ফুল, কুঁড়ি আর গাছটির চিহ্ন নেই কোনো

কোনো চিহ্ন নেই।

গোপীনাথ সিংহ

বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষা-আন্দোলনের পথিকৃৎ ও সক্রিয় বাম রাজনীতিক গোপীনাথ সিংহের জন্ম আসামের করিমগঞ্জ জেলার শিংলা অঞ্চলে। দ্রোহ ও বিপ্লবকে শিল্পিত ও কাব্যসম্মত করেই হাজির করেন কবিতায়, শেষত আশাবাদী তিনি। গোপীনাথ সিংহ পঞ্চাশের দশকের কবি। কবিতার পাশাপাশি ছড়া ও প্রবন্ধ লেখেন।

উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: *নিংশিং আরতি* [কাব্য]
কনাক মেঠেল [ছড়া]
বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী নবজাগরণর রূপরেখা [প্রবন্ধসংকলন]

ধূপের ছন্দে

নুংশিপির স্মৃতির আঙিনায়
এক ফোঁটা অশ্রুর তৃষ্ণায় যে প্রেম
পুষ্পবৃষ্টির ছন্দ-সুর না পেয়েই হারিয়ে গেল
হারাক
স্বর্গধূপের গানের তালে
নাচুক তা ধিন তা
আশার নৌকা যখন ফাল্গুনী পূর্ণিমার রূপে
সাগরের ঢেউয়ের সাথে কারও নাম জপে জপে...
মাঝনদীতে নিরাশার ঘূর্ণিতে...
নাই বা এলে হে হৃদয়,
স্বপ্নটা দীর্ঘ আয়ু নিয়ে বেঁচে থাকুক
মৃত্যুপাহাড়ে অরণ্যে
অমর প্রেমের বৃক্ষছায়ায়
কত যুগ কত কালের অপেক্ষায় থাকার দিন

প্রেমযজ্ঞের দগদগে আগুনের উপর
আমার জনম জনমের ইচ্ছেটুকু জ্বলে জ্বলে থাক...

নুংশিপি : এ শব্দটি অনুবাদে কখনোই প্রকৃত অর্থ বা ব্যঞ্জনা প্রকাশ করতে পারবে না। মায়াবতী/দুঃখিনী/প্রেমময়ী প্রভৃতি শব্দের কাছাকাছি ভাবা যেতে পারে।

গীতা সিংহ

গীতা সিংহের জন্ম ভারতের আসামরাজ্যের কাছাড় জেলার শিলচরে। নিভৃতচারী এ কবি লিখেছেন অল্প। তবে তাঁর সেই কবিতাগুলোতেই স্বাতন্ত্র্যের সুর স্পষ্ট হয়ে ওঠে। নারীত্বের মধ্য দিয়ে এক সর্বমানবতার আকাঙ্ক্ষাকে প্রেমকোমল করে ভাবরূপকে তুলে ধরেন কবিতায়।

সোনার স্বপ্ন

আজো পৃথিবীতে সে কারও মতো
ভেসে যায় রাতভরা জোছনায়
তাকে দেখে আমি অভিসারের স্বপ্ন দেখছি
আজো বাগানে নূপুরের তালে
দিশাহারা যত মালি
প্রেমপূজারির ফুল ছিঁড়তে
তাকে দেখে আমি পারিজাতের স্বপ্ন দেখছি।
আজো সকালে রঙিন সূর্যে
বুনেছি স্বপ্ন মলয়া বাতাসে
পাখিদের সুরে কোকিলের গানে
তাকে দেখে আমি সোনারোদের স্বপ্ন দেখছি
আজো
এখনো হিমেল বাতাসে
তাল বাজাচ্ছি নিখুঁত নিপুণ
এদিকে সেদিকে নেচে নেচে হায়
ওই তালে আজ তাল মেলানোর স্বপ্ন দেখছি
আজো চাইছি নীলাভ আকাশে
ফুল গাঁথতে উড়ে উড়ে
চাঁদ ও তারায় ভেসে যেতে যেতে
তাকে দেখে আমি দেখছি বাঁচার
সোনার স্বপ্ন।

চাম্পালাল সিংহ

কবি চাম্পালাল সিংহের জন্ম ১৯৫৪ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি শিলচরের পূর্ব কচুধরমে। মাত্র এগারো বছর বয়সেই কবিতা লেখা শুরু। ১৯৭৬ সালে *মাতামে* নামে একটি সাহিত্যপত্রিকার সূচনা করেছিলেন তিনি। অন্তর্গত প্রতিবাদের সঙ্গে প্রতীক, সংকেত ও জাতিগত উজ্জীবন এবং একই সঙ্গে নৈরাশ্যের সুর তার কবিতায় নির্মোহের মধ্য দিয়ে উচ্চারিত। দৃশ্যকল্পের খেলাও তাঁর কবিতার উপভোগ্য বৈশিষ্ট্য।

উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থঃ *হাবিত্তাউ ইতিহাস*।

ভাষাতত্ত্বের কথা

একটি প্রজাপতি উড়ে গেল
তার বুকের শুভ্রতা
ডানায় রঙের ফুলঝুরি
কে আর তুলনা দেবে তার।

আর
শৈশবে আমরা বরিষার দিন
'পাক্‌ঠি' নামে এক পোকা ধরতাম
ঝিঙের ফুলে ফুলে পাক্‌ঠির মেলা
পাখার রং-বেরঙে কচি মনে
আমোদের ছন্দের চেতনা জেগেছিল
সেই পাক্‌ঠিগুলো আজ আমার কাছে প্রজাপতি
উন্নত আজ ভাষাজ্ঞান আমার
প্রজাপতিরা আর কখনোই পাক্‌ঠি নয়
আমার কাছে।

আমি ভাবছি, গুট গুট হয়ে এখন
যুবকেরা
বিকেল হলেই নামে পাকঠি ধরতে
দেখি, প্রজাপতিরা
এখনও তাদের কাছে
পাক্‌ঠিই হয়ে আছে।

বৃষ্টি

বৃষ্টি পড়ছে
বৃষ্টি পড়ছে
উদ্বেগ তুমি দূর হও
সদর পথে গলি পথে
বৃষ্টি পড়ছে
গলগলিয়ে ছুটছে পানি
উঠান চিবুক পথঘাট সব
ভাসিয়ে নিয়ে
উদ্বেগ তুমি
দূর হয়ে যাও

সদর মাটি
অন্দর মাটি
ভিজিয়ে দিয়ে
ঝমঝমিয়ে
পড়ছে বৃষ্টি
জানলাগুলোর পাট কাঁপিয়ে
বৃষ্টি পড়ছে ঝমঝম ঝুমঝুম
চোখে নামছে ঘুম
কী মিষ্টি, কী নরম!
আঙিনায় নূপুর বাজে
করুণ শব্দে
কান্নায়।

পাতাল থেকে একদিন

একদিন পাতাল থেকে
একটি জলেল স্রোত উঠে এসেছিল
রোমাঞ্চশরীরে
কে তুমি ?
শরীর পুড়ছে, যাও, দূরে সরে যাও!

একদিন পাতাল থেকে
উঠে আসা একটি আগুন আমি
চোখের জলেই নিভিয়েছি

কে তুমি ?
একটু কাছে এসো, দেখি
চিনতে পারি কিনা।

খেলতে শুরু করল বাছুরগুলোর সঙ্গে

শীতে খিটখিট কাঁপছে একটি শিশু
গায়ে তার ময়লা একটি শার্ট
মাপের চেয়ে ছোট
পথে বসে আছে
রোদ মাত্র পড়ে আসছে।

একজন বৃদ্ধ
কয়েকটা গরু
গরুগুলোর সাথে দুটো বাছুর
খেলছে তিড়িং তিড়িং
শিশুটি বাছুরদের দেখে
সঙ্গ নিল

ছুটছে,
শুরু করছে খেলা সেও
বাছুরগুলোর সঙ্গে।

অভয় কুমার সিংহ

অভয় কুমার সিংহ কবি চাম্পালাল সিংহের ছদ্মনাম। এ নামে লেখা কবিতায় কবি টুকরো টুকরো দৃশ্যকল্প আর অনুভূতি নিয়ে মালা গাঁথেন। তাঁর কবিতায় আপাত শান্ত এক রাজনৈতিকতা আছে। কবিতাকে আবেগ নয়, চিন্তার ব্যাকরণ বলে ভাবতে পছন্দ করেন। উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ: *কাব্যময় এরে রাতিহান*।

বিচ্ছিন্ন অনুভূতি

১
ইটখোলার পথে দেখা
দেখেও দেখিনি আমি
তবু তুমি ডেকেছিলে–অভয় !

কৌতুকের হাসি মৃত্যুময়।

২
ঘরখানি ভরে আজ খনিজ আবহাওয়া।

৩
মুহূর্তে মুহূর্তে আমি হয়েছি অজ্ঞান
তোমার প্রতিটি স্পর্শে, এ কী মৃত্যু, এ কী অবসান !
বুঝেছি তখন
প্রেম মানে অনন্ত মরণ।

অমর সিংহ

অমর সিংহের জন্ম ত্রিপুরা রাজ্যের কৈলাসহরের ফটিকরায় গ্রামে। বয়ানের আধুনিকতায় নিজের জাতিগত সংস্কৃতিকে খুঁজে ফেরেন। পূর্বপুরুষদের জীবন ও সৃজনচিহ্নের জিজ্ঞাসা তাঁর কবিতাকে দিয়েছে ভিন্ন মাত্রা। *নুয়া এলা* ও *ফাগু* সহ বিভিন্ন পত্রিকায় লিখছেন। একমাত্র কাব্যগ্রন্থের নাম *লেইপাকথিপী উরল্লেই*।

পুরোনো পাতা কি ঝরে পড়বে ?

স্মৃতির নদীতে সাঁতার কেটে
আমি খুঁজে চলেছি
কে আমার প্রপিতামহ, পূর্বপুরুষ
বলে দাও
আমার জন্য কী রেখেছো তোমরা ?
অমাবশ্যার অন্ধকার লুকোচুরি খেলছে গাছের আড়ালে
হঠাৎ চিৎকার করে, দিশাহারা কণ্ঠস্বর
আমাকে পেয়ে যাবে, এই ভয়ে
ধুকপুক করছে প্রাণ
পেয়েছি আমি
পুরোনো কাঠের কিছু টুকরো– আগুনে পুড়ে যাওয়া
পুরো জন্ম ধুলেও আর উজ্জ্বল হবে না তারা
হাতড়িয়ে আরও পেয়েছি আমরা
একটি তুলসী গাছ–
আগুনের আঁচ লেগে টোটাফাটা
উত্তরাধিকার বলেই তা আমি বপন করলাম উঠানে
শুকনো বাতাসে ঝরে গেল পুরোনো পাতা
কী এক মায়া
যত্ন বাড়লো গাছে দিন দিন

দেখছি, পরিপূর্ণ আজ সেই তুলসী গাছ
কোমল সবুজ পাতায় তার
নতুন বাতাস, নতুন আলোর আভা লাগা।

সমরজিৎ সিংহ

বাংলা ও বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী দু'ভাষাতেই সিদ্ধহস্ত কবি সমরজিৎ সিংহের বাস ত্রিপুরা রাজ্যের আগরতলায়। ত্রিপুরা রাজ্য সরকারের পত্রিকা *ত্রিপুরা চে*'র সম্পাদনার দায়িত্ব ছিলেন দীর্ঘদিন। আসাম ও কলকাতার বিভিন্ন ছোট কাগজে একজন শক্তিশালী কবি হিসেবে পরিচিত তিনি । বাংলা ভাষায় লেখা তার *মাধবীলতা* গ্রন্থটি গোটা পশ্চিমবঙ্গে ব্যাপক আলোড়ন তুলেছিল। সমরজিৎ সিংহ খানিক নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে আধুনিক ব্যক্তিরূপের ভিতর দিয়ে কবিতার অধরাকে ধরতে চেষ্টা করেন।

মাতৃভাষা

এ রাত তোমার নামে উৎসর্গ করলাম
এই রাতে আমার শিয়রে বসে থাকো
আমি মানি, ভুল হয়েছে আমার
ভুলে রেখে এসেছি তোমাকে
ওহ্ জন্মভূমি
এই রাত আমার সঙ্গেই থাকো
কী নীরব রাত্রি, কথা বলার ভাষা পর্যন্ত নেই

আমার অক্ষমতার জন্য এই দশা
কপালই আমাকে বলে,
ওই যে পাথুরে ঘাটের ওপার থেকে
আমার দোষেই অভিশাপ দিচ্ছে ওরা
আকাশ থেকে ঝরছে আগুনের ফুলকি
কপালে, সব আমার দোষেই
আজকের রাত তুমি আমাকে বাঁচাও
এ রাত তোমার নামে উৎসর্গ করলাম
তোমার নামেই।

পায়ের নীচে হারিয়েছে মাটি

মা, তুমি কেমন প্রেমের মন্ত্র শেখালে আমাকে
সে আজ অতল বিষাদে ডুবে আছে
অযথাই বুকে ধরে রাখা স্তুতির পবিত্রতা নিয়ে
পূজা করেছি তার
মা, কেমন প্রেমের মন্ত্র তুমি শেখালে আমাকে
শেখালে
পা দুখানা মাটির সঙ্গে বেঁধে রাখো
ভোরের শিশিরে ভেজা ঘাসের সংসারে শুদ্ধ থেকো তুমি
ঘৃণার শরীরে পা দিয়ে
ত্রিকালবিজয়ী হৃদয় এখনো দাঁড়িয়ে আছে
ভরসা রেখো
হায়, ক্যামনে আকাল এল!
মাটি কাঁদছে, অগ্নিময় খরার আগুনে
পুড়ছে তিনকাল
কে এখন সোনার ধান জন্ম দেবে
মায়ের শুকনো বুকে মুখ লুকিয়েছে
কোন ভবিষ্যৎ ?
পায়ের নীচে হারিয়েছে মাটি
ধুলোয় কাঁদছে আমাদের প্রাণ।

ঈশ্বরের গল্প

রাতের প্রহর আজ চোখের আলোয় আলোকিত
কে তুমি!
উত্তর দিয়েছে, 'আমি জীবনঈশ্বর'
ঈশ্বরের কাঁধে আজ কালের বৈভব
আমার হৃদয়ে আমি
দেখি এক অসার ঈশ্বর।

অন্য এক জন্ম

ছড়িয়ে পড়েছে দীর্ঘ মরণের ছায়া
আমরাও ভয়ে আছি, ভেতরে ভেতরে
এখন আরেকবার বেঁচে উঠবার ইচ্ছে হয়
শিশুদের মতো
খেলবার আশায় নয়, বন্ধুর মায়াবী চুলে
ছড়ানো রোদের রং শরীরে মাখার পিপাসায়।

আরও একবার বেঁচে উঠবার জন্য
ভীষণ গোপন ব্যাকুলতা
দগদগে চুলার শেষ আগুনের মতো
আত্মীয়-স্বজন নয়, কল্যাণের জোট নয় কোনো
জননীর কোল পাব বলে–
এখনো আকাঙ্ক্ষা তীব্র, আরও এক জন্ম তুমি
আমাকে নতুন করে দাও বন্ধু হে !

মথুরা সিংহ

মথুরা সিংহের জন্ম আসামের করিমগঞ্জ জেলার শিংলায়। সহজ হিউমার ও এক ধরনের ড্রামাটিক আইরনি তাঁর কবিতার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য। *ফলাল* নামে শিশুদের একটি গুরুত্বপূর্ণ পত্রিকা বের করেন। মূলত: কবি হলেও প্রবন্ধ লিখছেন সাহিত্য ও অন্যান্য বিষয়ে। বর্তমানে *লোকতাক* পত্রিকার অন্যতম সম্পাদক।

উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: *আমার মণি, ইমা ও শহীদর নিঙে* [কাব্য]
আজিকার কথা [প্রবন্ধ]

তোমার কথায়

তোমার কথায় ভরসা রেখে
জল মেশালাম দুধে
বেচতে গিয়ে ধরা পড়লাম।

তোমায় খুঁজতে গিয়ে আমি
শূন্য আকাশ দেখে
চতুর্দিকের ব্যঙ্গভরা
হাসিতে যাই ঢেকে

সংকুচিত গুটি গুটি
ফিরি অন্ধ করে
তোমার কথায় ভরসা রেখে
পড়ল চাঁদও ঝরে।

সময়

সূর্যের আলোয়
একটি শাদা পদ্ম তুলে আনব
বলে
আমি ভোরের অপেক্ষা করেছি
সকালে
বাগানে যেতেই দেখলাম
গাছে আর এক ফোঁটা হাসিও
অবশিষ্ট নেই।

ফুল

তোমার জন্য দুঃখ হয়, ফুল !
যেখানেই ফোটো, হায়
মৃত্যু তোমার অনিবার্য।
ফুলশয্যার রাতে
মানুষের মিলনকে আরও শিল্পিত করে তুলতে
চিঁড়ে নিয়ে এল তোমাকে
টু শব্দটি করোনি
মানুষের আনন্দের জন্য
নিজেকে নিরুত্তর তুলে দিলে হাতে।
পূজার জন্য ঝুরি ভরে তুলে এনে
পূজা শেষে কী উন্নাসিক
ফেলে দিলো তোমাকে,
এভাবেই কি জন্মনির্লিপ্ত
যাবে এ জীবন
তোমাদের দিয়ে যে কুঞ্জ সাজিয়েছি
যে খোঁপা, যে কান
সাজিয়েছি যে বিছানা
খচ্ খচ্ কাঁটা বিদ্ধ করো
জর্জর বিক্ষত করে দাও
হয়তো তোমরা মনে করো
সবাই তোমাদের মতো সুন্দর, মহৎ
না–এক বিন্দু সত্য নয়, ফুল
যখন তোমরা কাছে থাকো না
মুহূর্তের জন্যও কি মনে করে তোমাদের!
ভালোবাসা, যে স্বপ্নেরও অনেক দূর।
এজন্য বলছি, ফুল
আজ আর নীরবতা নয়
এক টুকরো স্মৃতিও কি মনে রেখে যেতে নেই
একবার শুধু সবাইকে মনে করিয়ে দাও
তোমাদের ভেতরেও ছিল এক অন্ত্যজ আগুন।

রণজিত সিংহ

রণজিত সিংহের জন্ম ১৯৫৫ সালে মৌলভীবাজার জেলার কমলগঞ্জ থানাধীন ঘোড়ামারা গ্রামে। তরুণ বয়স থেকে লেখালেখি ও সমাজ-সংগঠনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী জড়িত। উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ *নিয়তি* ও *চিকারী বাগেয়া*। ছোটদের জন্য লিখেছেন *কনাক কেথোক, বাহানার-পরান* প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ। সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় রয়েছে তাঁর মূল্যবান অভিপ্রকাশ। লিখেছেন জীবনীগ্রন্থ, গবেষণাগ্রন্থ। সবচেয়ে মূল্যবান গ্রন্থ *স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলাদেশের মণিপুরী সমাজ*। বাংলা ও বিষ্ণুপিয়া মণিপুরী– দুভাষাতেই লিখে চলেছেন। পেশায় অধ্যাপক এ লেখক মণিপুরী সাহিত্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করছেন।

জেগে ওঠা

যেভাবে নদীর পার ভাঙে
সেভাবেই ভাঙছে সমাজ, স্বপ্ন, পুরোনো নিয়ম
ভেঙে যাচ্ছি আমরা সবাই
পুরোনো সমাজ থেকেও জন্ম নেয় নতুন সমাজ
পুরোনো নিয়ম থেকে নতুন নিয়ম
গাঁয়ের কুটিরে দেখো পুরোনো পোশাক পরে বসে আছে মা
তাকে তো সেখান থেকে হলো না লোকসম্মুখে আনা
আমাদের জানা নাই ভক্তি বা আচার
এখন সময়, এসো সবাই একত্র হয়ে সৃষ্টি করি কিছু
নতুন স্বপ্নের কিবা সম্ভাবনার জন্ম দিই, তাই
নীল খামে পাঠালাম চিঠি–
ওঠো তোমরা, জেগে ওঠো আজ।

আজন্মের ঋণী আমি

নিদানের দিন কারও দিকে হাত বাড়িয়েছি কিনা
কারও সঙ্গে হৃদয়ের আত্মীয়তা গড়েছি কিনা
সেই প্রশ্ন থাক
নিজেকে বাঁচাব বলে, নিজেকে বদলে নেব বলে
দিনরাত যুদ্ধ করছি আমি, প্রার্থনা করছি
আমাকে দীর্ঘ পরমায়ু দিয়ো প্রভু
শান্তি দিয়ো, একটু সুখের জীবন দিয়ো না হয়
কোমল সবুজ পাতা স্পর্শ করে
এই ভূমি এই জল ছুঁয়ে
প্রতিজ্ঞা করছি আমি, তোমার ঋণ একদিন শুধবই।
আকাশের দিকে চেয়ে চেয়ে ছড়িয়ে দিয়েছি হৃদয়
চাঁদের দিকে চেয়ে আলোকিত করি নিজেকে
তারার দিকে তাকিয়ে আমি তাদের মতো জ্বলতে শিখি
আর উল্কার মতো মুহূর্তের অস্তিত্বে
আশ্চর্য করে দিতে চাই সব চোখ।
বসন্ত এলেই ফুলে ফুলে ভরে যায় বাগান,
মধুর সন্ধানে ঘোরে ভ্রমরেরা
ওদের গুঞ্জন দেখে আমি যৌবনের রূপ দেখতে শিখি
নিজেকে সাজাতে শিখি রঙে ও বিন্যাসে।
রূপে গন্ধে পৃথিবীর সমস্ত সৌন্দর্যে নিজেকে ভরিয়ে রাখি,
ধরে রাখি আয়ুর সিংহাসন
পরমায়ু পাব না জানি, তবু
প্রকৃতির অনন্ত করুণা থেকে
না চাইতেই পেয়েছি কতো
শুধু তার ঋণশোধে ব্যর্থ হব আমি
দিনের পিঠে চলে যাচ্ছে দিন,
ঋণের বোঝায় ক্রমশ নুয়ে পড়ছি
জল-হাওয়া-শব্দ-গন্ধ... তাদের কাছ থেকে
কে আছে করে নিজে ঋণ
প্রকৃতির কাছ থেকে খালি হাতে কেউ ফেরে নাই।

মৌসুমী সিংহ

মৌসুমী সিংহের জন্ম আসামে ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দের ১৫ জানুয়ারি তারিখে। নিজস্ব জগতের চেনা অভিজ্ঞতার দৃশ্য ও ভাব থেকে বয়ান করেন। অল্প কয়েকটি শব্দ ও বাক্যের পুনরাবৃত্তি চেনার মধ্যেই অচেনাকে ধরতে সাহায্য করে তার কবিতাকে। প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ : *শাশাকপ তি না নিকুলিছ* ।

ও আমার কবিতা

ও আমার কবিতা
ক্যামন করে তুমি জন্ম নিলে
আশ্চর্য এমন!
তুমি তো আমার হৃদয়ে
নিবিড় ঘুমিয়ে ছিলে

তোমার জন্মের ক্ষণটি
এখনো আমার মনে গেঁথে আছে
ও আমার কবিতা!

দিল্‌স্‌ দেবজ্যোতি সিংহ

আসামের করিমগঞ্জ জেলার দুল্লভছড়ার কৃষ্ণনগর গ্রামে ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দের ৩১ মার্চ তরিখে কবি দিল্‌স্‌ দেবজ্যোতি সিংহের জন্ম। কবিতায় নানা ধরনের নিরীক্ষা করেন। *পিরামিড কবিতা* তার একটি উদাহরণ। *সনাতন মিশ্র* ছদ্মনামে অনুপ্রাসবহুল চৌপদী কবিতা লিখে আলোচিত হয়েছেন। *কুমারী দেবলা মুখার্জ্জী* ছদ্মনামে *অগত্যা* শীর্ষক একটি ভাষাতাত্ত্বিক প্রবন্ধগ্রন্থ রচনা করেছেন। নিখিল বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী স্টুডেন্ট্‌স ইউনিয়নের ১৯৭৯-৮০ সেশনে সভাপতি ছিলেন। স্বনির্বাচিত বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী কবিতা ইংরেজিতে অনুবাদ করেছেন।

ক্ল্যাসিক

চিরন্তন যত আছে নিত্য আধুনিক
মহাকাল প্রতিদিন দ্যাখে তারে ঠিক।
আধুনিক সে ভনিতা কাম্য নয় মোর
থাক সনাতন মন নর্তনমুখর।।

প্রতিধ্বনি

রংধনু সূর্যকে বলে, 'বাছাধন
আছি হে আকাশে আমি রাজার মতন'।
সূর্য হাসেন, 'ওহে রংধনু ভাই
তুমি যে বিলীন, যদি আমি মুছে যাই।।'

শ্রীকান্ত সিংহ

শ্রীকান্ত সিংহ একই সঙ্গে কবি ও চিত্রশিল্পী। জন্ম ১৯৫৭ সালে, করিমগঞ্জ জেলার শিংলা অঞ্চলে। বর্তমানে রাষ্ট্রীয় ললিতকলা একাডেমির স্বীকৃতিপ্রাপ্ত আসামে চিত্রশিল্পের প্রখ্যাত প্রতিষ্ঠান *গৌহাটি আর্টিস্ট গিল্ড*-এর সক্রিয় সদস্য এবং ১৯৮১ সাল থেকে রাজ্যিক ও রাষ্ট্রিক পর্যায়ে চিত্র প্রদর্শনীতে নিয়মিত অংশ নেন। তাঁর কবিতায় চিত্রশিল্পের ইমেজ ও বিমূর্ততার টুকরো টুকরো চিহ্ন পাওয়া যায়। উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ : *নংকুপীর জুরন* ও *জঙা বেলী*।

খেলা

আমার শব্দের স্পন্দিত প্রাণগুলো আগে
সাজিয়ে শেষ করি
পরে তোমাদের আলোকস্নাত স্বর্ণহার
প্রেম-ভালোবাসা আর
পদ-পদবির গল্প শুনব।
মায়া প্রেমের সমবেদনা
কার কার কাছে তোমরা ভাগ করবে
ভাগের সিস্টেমে ?
আমার চরণে নৈবচ
বিধি-নিষেধ,
কবির বিন্যাসে
চেতনা আমার।

দিল্‌স্‌ লক্ষ্মীন্দ্র সিংহ

দিল্‌স্‌ অর্থাৎ দুঃখিনী ইমার লেইরাপা শৌ [দুঃখিনী মায়ের অভাগা সন্তান]। এই সাংগঠনিক চেতনাকে নিজের পরিচয়ে এক করে নিয়ে একটি কাব্য ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক আন্দোলনের শৈল্পিক রূপকার কবি দিল্‌স্‌ লক্ষ্মীন্দ্র সিংহের জন্ম ১৬ সেপ্টেম্বর ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে ভারতের করিমগঞ্জ জেলার দুল্লভছড়ার কৃষ্ণনগরে। প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ *থরো*। কবিতার পাশাপাশি নাটক লেখেন এবং অনুবাদ ও সম্পাদনা করেন।

উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: *মণি বিসারেয়া, ইমালাম, না কাদি তি লোকতাগ* [কাব্য]
কল্লিঙ, এরে হে টেইপাঙ নিদান [নাটক]
সফোক্লিসের *আন্তিগোনে* ও এলিয়টের *ওয়েস্ট ল্যান্ড* [অনুবাদ]
সরারেল [সম্পাদনা]

ইনাফির প্রান্ত মেলে দাও

ইনাফির প্রান্ত মেলে দাও
এ মুখ লুকিয়ে রাখি আমি
ক্রমশ: বিষিয়ে ওঠা এই পৃথিবীতে
কোথায় আমার ঘর ?
তোমারই হৃদয় এনে একটু বিছিয়ে দাও,
আঁচল সরিয়ে
সেখানে হেলান দিয়ে কিছুদিন বেঁচে থাকি।

মাটির ছায়া হে

আমাকে ধরে নিয়ে যাও কোনো অন্ধ ভিখারির
দর্প চিনব না এমন কোথাও
যেখানে তপোবনে মুনিঋষিদের মতো মৌনতায়
নিশ্চুপ ধ্যানী সারি সারি আমগাছ
তাদের পায়ের নীচে মাটির ছায়ার মতো
ভিক্ষা চাইব পাখিওড়া অন্য এক জীবনের
তুমি কিন্তু থেকো সেই বিনম্র প্রার্থনার দিন
বেহুলার করুণ নূপুরবাঁধা পায়ে।

ইনাফি : মণিপুরী মেয়েদের কারুকার্যময় ওড়না বিশেষ

খোঁজ

আলো-অন্ধকার এসে ঠেলাঠেলি দিতে
দিশাহারা একজন মানুষ
আকুল চিৎকার করে– পথ পথ পথ...

বুড়োদের একটি দল কোনোমতে কাঠি -নুকুন পরে
হৈ হৈ করে ছুটে এলো।
জিজ্ঞেস করল–'পথ, কোন পথ ?'
সূর্যদেব আঁধারের দরোজা খুলেই
বের হয়ে বসে থাকে ছড়ানো রোদ্দুরে।
কাকে যেন চেয়ে চেয়ে
দরোজাটি বন্ধ করে আবার ঘুমায়।

আশ্চর্য মানুষ
কেউ তাকে বলতে পারে না
পারে না দেখাতে তাকে
তার পথটিকে
কেন না তাদের কারও জানা তো ছিল না
তাকে, তার পথটিকে
সত্যি বলতে সেও ঠিক চেনে না নিজেকে
নিজের পথকে
তবু তার ছিল এক প্রকৃত সন্ধান
মন ছিল
টান ছিল
যদিও সে কিছুই বোঝে না
তাই
আঁধারের আঠা আঠা পথে
মানুষটা হেঁটে গেল
পথের সন্ধানে।

কাঠি-নুকুন : বিশেষ এক ধরণের পৈতা, মূলত মণিপুরী পুরুষরা পরে থাকে

স্কেচ

শীতে ছেঁড়া কাঁথাটির মতো
বিছানো এ গ্রাম
হিমবাতাসে
গভীর নিশ্বাস
গাছে গাছে আধমরা প্যাঁচা ও শকুন
মাঝরাতে কারা এসে বেড়া ভেঙে যায়
ফেরালির চিৎকার শোনা যায় স্কুলে
আগুনের ফুলকি–আকাশে।

মালতীর আগেকার সেই করুণ, সরল
সোনার গ্রামখানি।

একটি মণির খোঁজে

প্রেম-মমতার যুদ্ধে
টুকরো টুকরো অর্জুন আমি
আধমরা, ছড়িয়ে ছিটিয়ে
পড়ে থাকলাম শূন্যে।

দেখে ফেললেন ভগবান
একজন দেবদূতকে ডেকে বললেন–
'ওকে পাতালের দিকে নিয়ে যাও
মণি দিয়ে বুলিয়ে দাও
ওর বিহ্বল হৃদয়'

দেবদূত যাত্রা করল আমার নতুন জীবনের জন্য
মণির সন্ধানে।

কোনো এক অর্থহীন জীবনের প্রতি

বলেছিলে আমাকে কানে কানে
মনে মনে
গহিনে
এক জীবনের অর্থহীন ক্রোধ আর অহমিকাকে
নারকেলের খোসার মতো খুলে ফেলে দাও
ছুঁড়ে ফেলে দাও ব্যর্থ জন্মভার
দুরে
ছিঁড়ে ছিঁড়ে দেখছি এই আশ্চর্য জীবন
একটি নিগূঢ়, নরম কবিতার গোপন আকাঙ্ক্ষায়

হাতের তালুতে কার রক্ত
হৃদয়ের,
নাকি ভগবানের ?

শিরোনামহীন কবিতা

নদী, ভায়োলিনের কোমল সুরের মতো
বয়ে যাচ্ছো এদিক-ওদিক
আমার চোখের জল ধুয়ে নিও তুমি
আমি এই জগতের রূপ দেখে শুনে থ হয়ে আছি
বনের মাঝখানে এক নিভৃত আমগাছের মতো।

সূর্যদেব

চোখ ডলতে ডলতে এসো সূর্যদেব
পুবের দরজা দিয়ে
ঘরের অন্দর ভরে
এ জগৎ আলোকিত হোক।
ডেকে উঠবে পাখিরা
চেনা বা অচেনা
পাখা থেকে ঝেড়ে ফেলবে আঁধারের প্রাণহারানো গান
সকালের পাহাড়গামিনীদের মতো বের হবে
খাদ্যের সন্ধানে।
ভাঁজে ভাঁজে ফুটে উঠবে ফুলের সুবাস
লিরি লিরি বসন্তের আসবে বাতাস
কোনো এক কোকিলের আদুরে সঙ্গীতে
ফাগু হয়ে ছড়িয়ে পড়বে
একটি মেয়ের মন এবং আমার দুঃখিনী
কবিতা।

এখানে যন্ত্রণা যত ঝুড়িতে ঝুড়িতে ভরে থাক।
যত অবিচার সব পথে ঘাটে পড়ে থাক গড়াগড়ি খেয়ে
কিছুই বলব না আমি।

ও সূর্যদেব, স্বভাবঘোড়ার পায়ে লাফাতে লাফাতে
শূন্যে উঠে এসো
সাতটি ঘোড়ার পিঠে চড়ে
অন্ধকার চুরমার করে দাও
এখানে কবিতা নিয়ে অপেক্ষায় আছি আমি
স্বাগতম জানাতে তোমায়।

সূর্যদেব : মূলশব্দ ছিল বেলীরাজা বা সূর্যরাজা। মণিপুরীরা সূর্যকে এভাবেই আলঙ্কারিক অর্থে সম্বোধন করে। এখানে পারিভাষিক ঘরানার সুবিধার্থে সূর্যদেব বলা হলো

সুধন্য সিংহ

সুধন্য সিংহের জন্ম আসামের কাছাড় জেলার মেহেরপুর পরগনার কালিঞ্জর গ্রামে। সহজ-সাবলীল বয়ান তাঁর কবিতার বৈশিষ্ট্য। উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ: *মাতামর ইরৌ*, *জাগরণী* ও *নুয়া আরাক জনমর*। সম্পাদনা করছেন সাহিত্য পত্রিকা *আর্জ্জুনি মণিপুরী*। দীর্ঘদিন নিখিল বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সাহিত্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক পদে ছিলেন।

সবুজ

সবুজের সঙ্গে থেকে আমিও সবুজ
ঘুমের ভেতর ডুবে থাকতে চেয়েছি
অতল সবুজে
তোমরা আমার এই ঘুম ভেঙে দিয়ো না আবার
শুনছি, শুনছি শব্দ তোমাদের পায়ে
ধীরে ধীরে মেপে মেপে চোরের মতন
আমার এ ঘুম ভেঙে দিতে যেন চেয়ো না আবার
মনে করো এ আমার
প্রতারণা, কিবা অহংকার
মনে মনে হয়তো ভাবো আরও কত কী যে!
এ প্রাণের তৃষ্ণাটুকু তবুও মিটাতে দাও
বাধা সৃষ্টি করো না ভুলেও।
সবুজের সাথে মিশে আমিও সবুজ
ঘুমের ভেতর ডুবে থাকতে চেয়েছি
শিশিরফোঁটার মতো জড়িয়ে ভিজিয়ে
দূরে–
সবুজ ঐ পাহাড়ের বুকে
মেঘের কয়েক শাদা টুকরোর মতো
উদ্দাম আমিও যেন ঘুরে ঘুরে থাকি দিনরাত
সবুজের সাথে থেকে নরম নিবিড়
সবুজের সঙ্গে থেকে আমিও সবুজ
ঘুমের ভেতরে কত ডুবতে চেয়েছি
সবুজ অতলে
কুয়াশায় ঢেকে গিয়ে যেমন হারায়
পাহাড়ের সবুজেরা বনে,
তোমরা কি কোনোদিন আমাকে সবুজ হতে
দেবেই না আর !

সুকান্ত রাজকুমার

সুকান্ত রাজকুমার কবি সুধন্য সিংহের ছদ্মনাম। তবে দু'নামে প্রকাশিত কবিতাগুলোতে দুরকম প্রবণতা লক্ষ করা যায়। সুধন্য যেখানে অনেকটাই প্রকাশবাদী, সুকান্তের কবিতা সেখানে চিত্রকল্পময়। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: *নুংশিপীরে* [কাব্য] ও *স্বাধীনতা* [নিগ্রো কবিতার অনুবাদ]।

বসন্ত বিকেলে

আমাদের বসন্তবিকেলে
তুমি এনে দিলে এক জাদুকরি পাখি
আমরা শুনছি তার গান
কোমল মধুর
স্বপ্নে রাঙানো দুটি ডানা মেলে দিল
সূক্ষ্ম কারুকাজে আঁকা, টানা টানা ভাঁজে
আমাদের এনে দিল পাখি
জীবনের শান্তি, স্বর্গসুখ
আমাদের নিঃসঙ্গ জীবনে
বসন্তবনের এই শুকনো ঘাসে, খা খা করা ডালে
তুমি কি ফুটিয়ে দেবে অগ্নিরঙা ফুল ?

কমলাকান্ত যাদব

কমলাকান্ত যাদবের জন্ম আসামের করিমগঞ্জ জেলার দুল্লভছড়ার কৃষ্ণনগর গ্রামে। তিনি জাতিতে মণিপুরী নন এবং তাঁর মাতৃভাষাও বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী নয়, তবুও ভাষাটি রপ্ত করে নিয়মিত লিখে চলেছেন এ ভাষাতেই। কবিতার পাশাপাশি প্রবন্ধও লেখেন।

বীণা

যেদিন তোমার ওই কণ্ঠের সুর
শ্রুতিতে পড়ল ঝরে, গভীর ঘুমের
অতলের থেকে জেগে, ধীর চরণের
ছাপ গুণে হেঁটে গেছি বুক দুরুদুরু।
কেমন যে টান তার, ডুবে ছিলে তুমি
লয় ও সুরের ঘোরে, যেন অচেতন
শূন্য যাত্রার ঘট ভেঙেছো যখন
কোমল ছোঁয়ায় করে সুখী জন-ভূমি।
হে অবাক বীণা, তুমি বেজে থাকো আজ
স্বপ্নে ও বাস্তবে, এঁকে ধ্বনিসাজ
প্রেমের সাহসলাগা ফোটাও বকুল
গহিন জগতে, তুমি মানসহারিণী
তোমারই যাদুসুরে বিমল রাগিণী
শেখাও হে সংগীত, থাক যত ভুল।

সন্ধ্যা সিংহ

সত্তরের দশকের শেষ দিকের কবি সন্ধ্যা সিংহের জন্ম আসামের করিমগঞ্জ জেলার পাথারকান্দিতে। নারিত্বের প্রাত্যহিকতার ভেতর থেকে চিরন্তন অনুভূতি প্রকাশ করেন কবিতায়। প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ: *রাঙিলা হপনর ফুলগরে* [১৯৮৩]। এছাড়া শিশুদের জন্য লিখেছেন *কনাকশৌর কবিতা*। *নুয়া এলা* সহ বিভিন্ন পত্রিকায় নিয়মিত লিখেছেন।

নিজের নামের একটি ফুল গেঁথে নিতে

নতুন সূর্যের আলো থেকে
একটি সাদা সুতো এনে
এক টুকরো রঙিন কাপড়ে
আজ আমি আমার নামের কোনো ফুল গাঁথব ভাবছি।
সোনামুখী সে সুঁইয়ের প্রতিটি ফোঁড়েই
লাল কাপড়ের সেই টুকরোটির ওপর
আকাশের তারা-নক্ষত্ররা এসে ফুটে উঠল যেন
তবুও ফেলল ছিঁড়ে সুতো- কেবল জঞ্জাল।
প্রতীক্ষার পথে বসে আছি
কখন আমার নামে তোলা ফুলটির
অক্ষরে অক্ষরে
আকাশের তারা-নক্ষত্ররা এসে আলোকিত হবে।

শিবেন্দ্র সিংহ

কবি শিবেন্দ্র সিংহের জন্ম ভারতের শিলচরের পূর্ব সিঙ্গারিতে। রাজনৈতিক বিপ্লবের প্রত্যক্ষ সৈনিক কবি শিবেন্দ্র কবিতাকে আগুনের আঁচে যাচাই করে নেবার শৈল্পিক প্রবণতায় ঋদ্ধ। *লালফামে* ['৮২-৮৫], *বিদ্রোহী* ['৯০] , *সাত বেইবুনির শৌ* ['৯৫] প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদক শিবেন্দ্রর প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ হচ্ছে *মইবং* ও *শতাব্দী*। বিপ্লবীধারার কবিতা লেখেন। সাহিত্যকে জীবনবদল ও শ্রেণিসংগ্রামের হাতিয়ার মনে করেন।

যতদিন বাল্মীকি হইনি

ক্ষমা করো না মা এই রত্নাকরকে
যতদিন বাল্মীকি হতে পারিনি
তোমার ছেঁড়া শাড়ি, মরিচাধরা কানের ঝুমকা
আর মলিন নোলক দেখেও বসে আছি অথর্ব সন্তান
ক্ষমা করো না মা এই রত্নাকরকে
বাল্মীকি হইনি যতদিন
তোমার অনাদরে বেড়ে ওঠা দীর্ঘ নখ
শরীরের ময়লা আর জটাধরা রুক্ষ চুলের দিকে
চেয়েও নীরব আছি এখনো
ক্ষমা করো না এই রত্নাকরকে
বাল্মীকি হইনি যতদিন
কোটরে ঢুকে যাওয়া তোমার দুটি চোখ
বুকের কঙ্কাল, হাড়, চুপসে যাওয়া স্তন
একদিন এ জগতে অমৃত ঢেলেছে প্রাণে
কোনোকিছুই পারল না আগুন ধরাতে এ মনে
ক্ষমা করো না মা এই রত্নাকরকে
যতদিন বাল্মীকি হইনি।

বিশ্বজিৎ সিংহ

আশির দশকের কবি বিশ্বজিৎ সিংহের জন্ম ত্রিপুরার কৈলাসহরে। মার্ক্সিস্ট নান্দনিকতার জায়গা থেকে কবিতাকে দেখতে চেষ্টা করেন, মিতবাক ও চিত্রকল্পময় তার কবিতা। ডিটাচ্‌মেন্টের একটা খেলাও আছে তাঁর কবিতায়। একমাত্র প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থঃ *ঈশ্বর মাঙছে মেইথঙে।*

ঈশ্বর হারিয়ে শেষে

মনে ছিল হব এক মাতাল প্রেমিক
সুরাকে রেখেছি বেঁধে রঙিন কাচের ঘরে
সময় আসতেই শুরু দিকশূন্যজ্ঞান
ব্যাকুল মুখটা ওই দেখব বলতেই
                    ভাঙা আয়নায়
দস্যু এক ঘর বানিয়েছে।
সামনে উসখুস বড়ো গুপ্ত অসময়
একটা পিঁড়ি ছুঁড়ে দাও! এক মুঠো চাউল!
অক্ষরের পরে আরও অক্ষর সাজিয়ে
                    ইতিহাস গড়েনি দালান।
কাকে দেখব–সব মুখ তৃষ্ণা ভুলে গেছে
ঝঞ্ঝার ভিতর দিয়ে ফেরা মানুষের
                    আশ্চর্য কাহিনিগুলো
এখনও নীরব রয়ে গেল
ভেবে তো ছিলাম, হব এক মাতাল প্রেমিক
এদিকে যে ভেতরে আরেক
ভাঙা জগতের যুদ্ধ হলো শুরু
এখন কোথায় পাব সযত্নে হারিয়ে যাওয়া
                    আমার সে 'আস্‌তিক' মণিকে!
শূন্য হাতগুলো শোনো, একটু প্রতিজ্ঞা রাখো
অস্তিত্বে মরিচা ধরেছে জেনেও আমি
পুনর্জন্ম দেখব বলে আছি প্রতীক্ষায়।

আস্‌তিক মণি : মণিপুরীদের সর্প বিষয়ক একটি মিথ। আসতিক্ মণি সর্প বা সর্পবিষের হাত থেকে রক্ষা করে। এখানে সম্ভবত অস্তিত্বরক্ষার ভাবার্থে শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।

কোথায় আছো

কোথায় আছো তুমি, সুখে নাকি ক্ষুধায় ?
ভীষণ ইচ্ছে করছে তোমাকে
দুহাতের ভিতর বন্দী করে নিতে
দেহের দরজা খুলে ঢুকতে চেয়েছি বলে
উপবাসী আমি বিন্দু থেকে সিন্ধু পেতে চাই, যাবার আগে
কোথাও হয় না যাওয়া আজকাল,
অনন্ত পথের মাঝখানে
দাঁড়িয়ে আছি পানির ছায়াতক না পড়া জঠরে
কাছাকাছি দাঁড়িয়ে অনেক গল্প হলো,
শাদা-কালোয় উদ্‌ভ্রান্ত
নগ্ন সুখ একাকী রইল প্রতীক্ষায়
কোথায় আছো তুমি, সুখে নাকি ক্ষুধায় ?
ক্ষুধা তো জন্মান্ধ
রক্তে স্নান নিয়েছে যাত্রার পথ
আরও দীর্ঘ হয়ে গেল বৃষ্টির আকাঙ্ক্ষা
এক আতঙ্কের মাঝেই ভেঙে গেল উৎসব
ফেরার পথে যখন বৃষ্টি এল–
ক্ষুধার ভেতরে আমি প্রতীক্ষায় আছি।

রঞ্জিত সিংহ

গত শতাব্দীর আশির দশকের কবি রঞ্জিত সিংহের জন্ম ভারতের আসামে। অনন্য রূপকল্প ও শান্ত সমাহিত বয়ানধরণ তাঁর কবিতাকে চেনা উপলব্ধি থেকে অন্য এক জীবনবোধের দিকে নিয়ে যায়। রাজনীতিস্পর্শী এক গভীর হাহাকার তাঁর কবিতায় যেন লুকিয়ে থাকে। একমাত্র প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ: *মোর ইমার ঠার মোর প্রেমর কবিতা*।

আজও সে আসে

আর
বিধবা নদীটি এসেছিল
আমাদের উঠান পর্যন্ত।
মন্দ্রিত রৌদ্রের মতো কী শান্তি
স্বপ্ন দেখেছিল সে।
বিশ্রামহীন তিন রাস্তার কোনো পুলিশপয়েন্টের মতো
উদ্‌ভ্রান্ত এখন।
তৃষ্ণাথরথর বুক চাপড়িয়ে কেঁদে কেঁদে
আমার কাছে চেয়েছিল দু'ফোঁটা জল
আমি নিরুপায় ভয়ে লজ্জায়
ঘরের ভেতর নিঃশব্দ বসেছিলাম
এখনও আমি ভিজে উঠি চোখে–
এমন নিস্তেজ আমি
এমন নিম্নজ!
আর
বিধবা নদীটি এসেছিল
আমাদের উঠান পর্যন্ত।

জীবনের গল্প

শীতসকালের রোদের টুকরোগুলোও
নিয়ে গেল তারা
আকাশছোঁয়া দালানের এক কোণে
তিন-চার বছরের একজন 'নাগরিক' ও
থুত্থুরে বুড়ো 'বুদ্ধিজীবী'টির জন্য
সাজিয়ে রাখলো।

অবশ্য কোনোদিনই
দুপুরের খা খা রোদ্দুরের দেখা
মেলে না তাদের
শীত-তাপ নিয়ন্ত্রিত ঘরে
বন্দী আজ তাদের জীবন।
তখন
সূর্যবাবু আমাদের সন্ধানে আসেন
তাকে কোলে করে, পিঠে করে
বুকে আঁকড়ে ধরে
জীবনের সব গল্প নিয়ে, গর্বে ও উচ্ছ্বাসে
বিশ্বপরিক্রমা করি আমরা।
অতঃপর
নিস্তব্ধ রাত
ফুটপাতের গাছগুলোতে, লতাপাতায় আর
নর্দমার ময়লা পানিতে
টুকরো টুকরো জোছনার ধোঁয়াছবিতে
লেখা থাকে আমাদের দুঃখ-বেদনার কথা
পোড়া শরীরে ন্যুব্জ হয়ে উষ্ণ করে রাখি
কাছের- দূরের
তাদের- আমাদের
বেঁচে থাকার ইতিহাস।

কবিতা তোমাকে

শীতের কোনো রাতে যদি
তোমার হাতের আঙুলে
কাঁচা কোমল প্রেমের গন্ধ পাই
আমাকে জড়িয়ে রেখো উষ্ণ করে
নিঝুম, নিস্তব্ধ, অন্ধ আঁধারের শরীরে।
কান পেতে শোনো মৌনতার কণ্ঠে ঝরা
অতীতের টুকরো টুকরো গল্প
টের পাবে
প্রেমের কবোষ্ণ গন্ধ
মিলনের অভিমান
বিরহের বেদনা
ভুলতে চেয়েও যদি সম্ভব না হয়
দূরে ঠেলে দিয়ো না কিন্তু
তোমার আমার
আমাদের গড়া
নিষ্ঠুর নীরব অতীত।
একদিন আমিও থাকব না আর
এই পৃথিবীতে
আমাকে দেখবে না তুমি
কোনো দূর পাহাড়ে জঙ্গলে কিংবা
কোনো বদ্ধ জলাশয়ে
তোমার হলুদ, শুষ্ক পাতার মতো
বিক্ষিপ্ত হৃদয়ের দরজা খুললেই
চোখে পড়ে যাবে
পাকা ফল কখন যে
ঝরে পড়ে যায়
পরিপূর্ণ গাছ তা জানতেও পারে না
কী নিবিড় মৌন এই
জন্ম-মৃত্যু,
প্রকৃতির আশ্চর্য খেলা।

সুখময় সিংহ

সুখময় সিংহের জন্ম ১৯৬৮ সালে মৌলভীবাজার জেলার কমলগঞ্জে। কবিতা লেখেন নীরবে-নিভৃতে। তাঁর কবিতায় চাপা অভিমানের কাব্যিক সুরটি বেশ মজার। একমাত্র প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ *তোর নিংশিঙে*।

আমি যা লিখিনি

আকাশের চাঁদ, তারা আর সূর্যের রং
পৃথিবীর জন্ম থেকে আজ পর্যন্ত
সব কবিই লিখে গেল কবিতায়, নানা উপমায়
কেউ কি পারল ঐ চাঁদ, তারা কিংবা সূর্যের মতো
উজ্জ্বল করতে নিজের কবিতা ?
পৃথিবীর জন্ম থেকে আজ অবধি যত কাব্য রচিত হয়েছে
সেসব মিলেও কি পারবে আকাশ আলোয় ভরিয়ে দিতে ?
যে মহান শক্তি আকাশের কাব্য লিখেছে
চিনি নাই তাকে,
অক্ষর আছে রহস্যের ভাষা নিয়ে
যখন চিনতে পারব, অক্ষর চিনে চিনে
যদি আমি থাকতে পারি মহাসত্যের মাঝে,
তা-ই হবে আমার প্রকৃত কবিতা
যা আমি কোনোদিন লিখিনি জীবনে।

কমলেশ সিংহ

নতুন শতাব্দীর কবি কমলেশ সিংহের জন্ম ভারতের আসাম রাজ্যে। কবিতাকে গীতলতা ও আবেগের চেয়ে চিন্তার দিক দিয়ে ভাবতে পছন্দ করেন। খুবই কম লেখা প্রকাশ পেলেও সেগুলোতেই তার নতুন চলনের কাব্যযাত্রার পরিচয় পাওয়া যায়।

ওঁ শব্দ

শব্দ হচ্ছে
শব্দের ভিতরে শব্দ
নিঝুম নিস্তব্ধ ঘুম—
শুয়ে থাক অশ্রু।

লাশ পড়ে আছে
আমার আত্মা ভ্রমণে বেরোলো
শব্দও হারায়
শব্দের ভিতরে শব্দ
নিবিড় নিস্তব্ধ ঘুম

কেঁপে ওঠে অশ্রু
বেঁচে উঠছে লাশ
আরেকবার আমার এই
দেহখানি ভ্রমণে বেরোলো।

শুভাশিস সমীর

শুভাশিস সমীরের জন্ম ১৯৭৮ সালের ২৯ জানুয়ারি কমলগঞ্জের ঘোড়ামারা গ্রামে। কৈশোর থেকে লিখছেন বাংলা ও বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষায়। উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থঃ *সেনাতম্বীর আমুনিগৎত সেম্পাকহান পড়িল অদিন* ও *নুয়া করে চিনুরি মেয়েক*। বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষায় অনুবাদ করেছেন বড়ু চণ্ডীদাসের কাব্য *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাটক রুদ্রচণ্ড। মণিপুরী থিয়েটারের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি শুভাশিস সমীর *মণিপুরী থিয়েটারর পত্রিকা* নামে একটি ছোটকাগজও সম্পাদনা করছেন।

আয়না

দুইজনে মিলে আমরা হয়েছি এক
একজনে করে, আরজন শুধু দ্যাখে
দুইধারে এক আয়না বসানো আছে
আরও একজন উঁকি দেয় থেকে থেকে।
মাটি ক্ষয় হলে মাটিতে গিয়েও মাটি
আয়না তখন কোথায় মিলিয়ে যায়
তোমার নিকটে গেলে তুমি কেন মিছে
পাঠিয়ে দিয়েছো দুয়ের অন্তরায় ?
দুইজনে মিলে এক, তবু এক নই
আর কে সে করে মাঝখানে আনাগোনা
চোখ ঝিমালেই পথখানি সোজা কতো
আয়নার নেই সাধ্য যে রেখা টানা।

সন্তোষ সান্তান

তরুণ কবি সন্তোষ সান্তানের জন্ম ১ জানুয়ারি ১৯৭৯ সালে আসামরাজ্যের করিমগঞ্জ জেলার দুল্লভছড়া অঞ্চলের কৃষ্ণনগর গ্রামে। প্রতিষ্ঠান-বিরোধিতার তার্কিক জায়গা থেকে হিউমারের মধ্য দিয়ে কবিতা পেশ করতে চেষ্টা করেন তিনি। *নুয়া এলা* সহ বিভিন্ন পত্রিকায় তার কবিতা নিয়মিত প্রকাশিত হয়। তিনি আসামের কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখপত্র *চেতনা*র সম্পাদক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন।

সম্পর্ক সিরিজ : ২

ইস্কাবনের বিবির সাবঅল্টার্ন কাঁচুলির সৌন্দর্যে নিপুণ এক কবিতা লিখতে যাব, এমন সময় হাতের তালু দাবি করে রাজসুলভ ভাগ্যলিপি। যে শিল্পের টানে একজন জন্মকবি দারিদ্রের সাথে সংসার পাতে, সেই নির্বাক শিল্প ছড়িয়ে থাকে অতিচেতনায়, যুক্তির বাইরের কোনো পৃথিবীতে। ঈশ্বরের লীলা যেন মাকড়সার জাল। ঈশ্বরও এখন বৃদ্ধ। তাকেও স্ট্রাগল করে বাঁচতে হয়। আকাঙ্ক্ষায় পূর্ণ আজ পিতলের বাটিখানা। প্রতি পদক্ষেপে বিধিনিষেধ, বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ট্যাবু
সান্ধ্য আরতির মৃদঙ্গের তালে তালে নাচে নারীদের কণ্ঠ। জয়দেবের গীত শুরু হলে আসরের বৈষ্ণব-নামাবলী থেকে নেমে আসেন অষ্টসখির প্রাণধন কৃষ্ণ । কৃষ্ণ, ময়ূরকণ্ঠী রঙের নামবাচক এ বিশেষ্যের দ্বিতীয় অক্ষরটি যুক্তবর্ণ; ষ ও ণ, এ দুই ব্যঞ্জনের মাঝে ছোট্ট একটি ফাঁকও খুঁজে পেলাম না, যেখানে অনায়াসে ঢুকিয়ে দিতে পারব বর্ণিল কিছু মানবতা। এদিকে ক খুব একলা, তার সাথে মিশে আছে ঋ কার, একা থাকলে তার গায়ে মেখে দিতাম কনেরাঙা মমতা; আর কলঙ্কিনী রাইয়ের জন্য খয়েরি রঙের কিছু স্মৃতি। কলঙ্কিনী রাই আসলে এমন একটি নাম যার কোনো সর্বনাম নেই, আছে শুধু আঁকিবুকিহীন দুঃখিনী বিশেষণ। আমরা জানি, বিশেষ্যর সাথে বিশেষণের ব্যবহার আত্মিক তৃপ্তি এনে দেয়।

ঘোমটার মতো শাদা কুয়াশা পৃথিবী মায়ের কোলে ছড়িয়ে পড়লে অবুঝ এ মন বৈষ্ণব-খড়ম, অহংকারি সানগ্লাস, অপরূপ কবিতা সব রেখে বৃন্দাবনের দিকে সরে পা বাড়ায়।

কাঁচুলি : মূলশব্দ ছিল য়াবেরুনী। শব্দটির সাংস্কৃতিক গুরুত্ব আছে। আগে মণিপুরী মেয়েরা প্রায়ই শরীরের উর্ধ্বাংশে প্রায়ই কাঁচুলির মতো এ বস্ত্রটি ব্যবহার করত

আত্মস্বার্থজাত। তাই, সে এতটাই ক্লীব ও অশ্লীল। সেখান থেকে কোনো কিছু সজীব বা প্রাণবন্ত উৎপন্ন হওয়াই সম্ভব নয়। বরং সকল প্রকারের উৎপাদনের এবং মানসিক চাষবাসের গোড়াতেই জল ঢেকে দেয়ার অপপ্রয়াস, এবং কূট চালাচালির সম্প্রসারণ ঘটছে অতি দ্রুত। এবং লেখালেখির প্রয়াস বা অপপ্রয়াস এই সার্বিক দূষণপ্রক্রিয়া থেকে মুক্ত নয়।

কবি শুভাশিস সিনহা (জন্ম ১৯৭৮, ২৯ জানুয়ারি) অন্তত ক্ষণিকের জন্য হলেও, বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী কবিতার অনুবাদের সাহায্যে সচেষ্ট হয়েছেন, মুক্ত হাওয়া বইয়ে দিতে। শুভাশিস সিনহা বাংলা ভাষার তরুণতম কবিগোষ্ঠীর অন্যতম। তার নিজস্ব ভাষায়, অর্থাৎ বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষাও তিনি একজন প্রধান কবিতাকর্মী। সর্বভারতীয় পর্যায়ে প্রতিষ্ঠা, প্রশংসা এবং পুরস্কারও জুটেছে তার। সুতরাং বলা যেতে পারে বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী কবিতার বাংলা ভাষায় রূপান্তর তার থেকে দক্ষ আর কেউ নন। তিনি কাজটি সম্পন্ন করেছেন সুচারু ও সৃজনশীল হাতে। এখন আমরা এতকাল সে কবি ও কবিতার প্রতি মুখ ফিরিয়ে থাকলেও শুভাশিস এগিয়ে এসেছেন সন্দেশ এবং নেমন্তন্ন নিয়ে। সাড়া এবার আমাদের দিতেই হবে। আশা করি, পাঠক চাইবে না যে, এই শুভলগ্ন বিফলে যাক। টান পড়ুক আমাদের অনাকাঙ্ক্ষিত আত্মদম্ভে। বাংলা কবিতারও লাভ হবে প্রচুর, নতুন আয়োজনে উন্মুখ হয়ে উঠবে সেও। কবি শুভাশিস সিনহা, আপনাকে ধন্যবাদ।

মোহাম্মদ রফিক
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

শুভাশিস সিনহার জন্ম ১৯৭৮ সালের ২৯ জানুয়ারি মৌলভীবাজার জেলাধীন কমলগঞ্জ থানার ঘোড়ামারা গ্রামে। ছোটবেলা থেকে লিখছেন বাংলা ও বিষ্ণুপ্রিয়া মনিপুরী ভাষায়। দু'ভাষাতেই একাধিক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগ থেকে স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রী নিয়ে শুভাশিস বর্তমানে কমলগঞ্জের মাধবপুরস্থ মণিপুরী ললিতকলা একাডেমীতে নাট্যপ্রশিক্ষক হিসেবে কাজ করছেন। তবে প্রথম ও প্রধান নেশা কবিতা, তারপরই থিয়েটার।

প্রকাশিত গ্রন্থ : দশটি দীর্ঘশ্বাস
ডেকেছিলাম জল (কাব্য)
প্রকাশিতব্য : প্রতিরূপকথা (নাটক)